রাজেশ্বরী
কিশোর
কিঙ্কর আহ্সান

এই উপন্যাসের কোথাও 'বর্ণচোর' নন কিঙ্কর আহ্সান। দিকে দিকে যখন শুধুই নস্টালজিয়া, পিছুটানের পরম্পরা আর ইতিহাসজীবি পলায়নপর সাহিত্যিকের সাহিত্য-পসরা, সে সময় কিঙ্করের 'রঙিলা কিতাব' সমসায়িক বাংলাদেশের নগদ-চিত্র। এ উপন্যাসে পাঠকের সম্মুখে ঘটবে খুন-খারাবি, সোবহান মেয়ার পোলের পাশে লাশের বদলে লাশ ভেসে উঠবে পাঠকের চোখে, ক্ষমতালিপ্সু মানুষেরা পথের কাঁটা সরাতে দেরি করবে না সেখানে। আজকের বাংলাদেশের অদ্ভুত আঁধারের 'জোনাকি' রঙিলা কিতাব। প্রদীপরা নওরোজ শাহের নির্দেশে শত্রুকে খুন করে পালিয়ে আজীবন হবে অনিকেত। বাংলা থেকে ভারত, ভারত থেকে নেপাল--দেশান্তরি হয়ে খুনের পাপে ফুল হয়ে ফুটে থাকবে পথে-প্রান্তরে। মৃত্যুযাত্রীর মনে পড়তে থাকবে পরিজনের কথা। দাবার গুটির চালের মতো ক্ষমতালোভীর রাজনীতির চালে মীমাংসিত হবে জীবন-খেলা। জিতবে বণিক-ব্যবসায়ী। পুঁজিবাদী গ্রহে যার টাকায় রাজনীতিক চরিত্রটি নির্মিত হয়, কখনোবা ব্যবসায়ী খোদ বনে যাচ্ছে রাতারাতি নেতা--জীবনের বিরুদ্ধে টাকার খেলা। জাহাঙ্গীররা কিছু বুঝে উঠতে না উঠতেই করে ফেলবে বিশ্বাসঘাতকতা। এই দুষ্টচক্র আবর্তিত হতে থাকে স্বাধীন বাংলাজুড়ে। ব্যক্তিস্বার্থ কায়েমে জনগন আজন্ম বোকাসোকা। ভালো কেউ, যেমনটি এই উপন্যাসে এমপি, খুনে মরে মিথ হয়ে যান। উপনির্বাচনে কেন্দ্র চাইবে এমপির বিধবা স্ত্রীকে--ইমোশন, মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইবে এমপির ভাই জয়নালরা--সুযোগের সৎব্যবহারে এমপি-মন্ত্রী। কিন্তু 'ইঁদুরে কপাল'এ আচমকা একটা ধেঁড়ে ইঁদুর এসে পড়ে। সেই ইঁদুরই নওরোজ শাহের কাছের একজন যে মাত্র পাঁচদিনে পুরো শহরের রাজনীতির গল্প বদলে দেয়। প্রদীপের স্ত্রী সুপ্তির নতুন শিশু আর কাছের একজনের রাজনীতির বয়স একসাথে বাড়বে, বাড়ছে। ভারাক্রান্ত স্বপ্নের বাংলাদেশ। গন্তব্য কোথায়?
কিঙ্কর সাবলীল গদ্যে এসবই লিপিবদ্ধ করেছেন 'রঙিলা কিতাব'এ। উপন্যাসটি এভাবেই সত্যিকারের কিতাবের মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়।

-মেহেদী উল্লাহ্

উৎসর্গ

ফরিদুল ফাহিম

পছন্দের ভাইটি। যার প্রতিটি কাজই আমার চরম অপছন্দের।

কিঙ্কর আহ্সান / রঙিলা কিতাব

প্রথম প্রকাশ: অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৫
প্রকাশক: ফয়সল আরেফিন দীপন
জাগৃতি প্রকাশনী
৩৩ আজিজ সুপার মার্কেট
নিচতলা, শাহবাগ, ঢাকা ১০০০
আলাপন: ৮৬২৩২৩০

প্রচ্ছদ: মেহেদি হাসান
মুদ্রন: দি ঢাকা প্রিন্টার্স
পান্থপথ, গ্রীনরোড, ঢাকা
মূল্য: ১৬০ টাকা

Online distributor: www. Rokmari.com
https://www.facebook.com/kingkorahsan2

১.

২৭ জুলাই, ২০০৮ : মধ্যরাত তবুও

পায়ে গুলি লেগেছে প্রদীপের।
বাস ছুটছে। মধ্যরাত। বগুড়া পার হলো রোজিনা পরিবহনের বাসটি। যাত্রীরা ঘুমোচ্ছে। প্রদীপের চোখে ঘুম নেই। যে কোন সময় পুলিশ বাস থামাতে পারে। নিজের বিপদ নিয়ে চিন্তা নেই তার। যত চিন্তা সন্তানের জন্য। স্ত্রী সুপ্তি গর্ভবতী। প্রথমবারের মতন বাবা হবে প্রদীপ। অন্যরকম এক ভালোলাগা মনের ভেতর। এ সময়ে এমন বিপদে বড় এলোমেলো লাগে সব।
প্রদীপ খারাপ লোক। খুনী। কিন্তু তাই বলে সন্তানকে ভালোবাসবে না, সন্তানের ভালোর চিন্তা করতে করতে ঘুম হারাম করবে না, এমনতো না!
বড় ধরনের ঝামেলা না হলে এখন সে কিছুতেই দেশ ছাড়তো না।
অসুস্থ অবস্থায় সুপ্তিকে নিয়ে এমন টানাটানি করবার কোন মানে হয়না।
বাসে চড়তে পারেনা সুপ্তি। তার বমি হয়। ঢাকা থেকে বগুড়া পর্যন্ত আসতে আসতেই কয়েকবার বমি করেছে মেয়েটা। ক্লান্ত খুব। প্রদীপের বুকে মাথা গুজে ঘুমোচ্ছে এখন।
শীত পড়েছে। বাসের জানালা দিয়ে হুড়মুড়িয়ে ঢুকছে ঠান্ডা হাওয়া। উড়ছে সুপ্তির এলোমেলো চুল। জানালাটা টেনে দিয়ে সুপ্তির চুলগুলো ঠিক করে দেয় প্রদীপ। সাথে আনা চাদরটা দিয়ে মেয়েটার শরীর ঢাকে। ঘুমের ভেতর একটু নড়েচড়ে বসে সুপ্তী। গর্ভবতী হবার পর কেমন একটা মা মা ভাব চলে এসেছে চেহারায় । বড় ভালো লাগে দেখতে। শান্তি শান্তি লাগে।
আকাশে মস্ত চাঁদ। মেঘের আড়ালে চাঁদটা ডুব দিয়ে আবার হাজির হয় আচমকা। কেমন একটা সাদা চাঁদর বিছানো রাতের নরম আঁধারের গায়ে। একটা দুটো তারা এদিক ওদিক ছড়ানো। রাস্তার দু-ধার পাহাড়া দিচ্ছে বড় বড় গাছগুলো। একটানা তাকিয়ে থাকলে কালোর পাহাড়ে আটকে যায় চোখ। মনে হয় নিশি ডাকছে হাতছানি দিয়ে। মায়াময় একটা পরিবেশ। একটু একটু ঘুম পায় প্রদীপের।

সাথে থাকা লুকানো অস্ত্রটা ঠিক আছে কিনা দেখে নেয় সে। টের পায় পায়ের যন্ত্রনা। রক্ত মনে হয় পড়ছে এখনও। গুলি লাগার পর ব্যান্ডেজ করা হয়েছে। ওষুধও খেয়েছে প্রদীপ। রক্ত পড়া বন্ধ হবার কথা। হয়নি। ব্যান্ডেজের ভেতর কি হচ্ছে বোঝা যাচ্ছেনা।

পা'টা চুলকাচ্ছে। তবুও সে নড়েনা। সুপ্তীর যেন ঘুম না ভাঙে সেদিকে সজাগ নজর।

প্রদীপ ঘুমায়। সামনে থাকা চাঁদ, তারা, আঁধারে গা ডুবিয়ে থাকা বৃক্ষ চোখের আড়াল হয়। কে যেন বলে, 'ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি, মোদের বাড়ি এসো...।' আসলেই কি কেউ বলে? নাকি সবই মনের কল্পনা!

গাড় ঘুম। সে ঘুমে সে কই কই'ই না যায়। যন্ত্রনাদায়ক সব স্বপ্ন এসে ভীড় করে। একটা স্বপ্নে সে'তো প্রায় মরতেই বসে। গুলি পায়ে না লেগে বুকে এসে লাগে। একটা ভালো স্বপ্নও দেখা হয়। সুপ্তিকে দেখা যায় সন্তান কোলে নিয়ে। সন্তানের চেহারাটা স্পষ্ট ঠাওর হয়না সাদাকালো স্বপ্নে। প্রদীপ কাছে গিয়ে যখন সন্তানকে দেখার চেষ্টা করে তখনই বাসের হর্ণ শোনা যায়। কানের কাছে এসে কর্কশ কণ্ঠে হেলপারটা বলে, 'যাত্রীরা ওঠেন। বুড়িমারি আইসা পড়ছে। এইখানে আপাতত রেস্ট নিবেন। তারপর সকালে পাসপোর্ট নিয়া দুনিয়ার ঝামেলা আছে। ওঠেন। নো লেট।'

কাঁচা ঘুম ভাঙে প্রদীপের। জানালা দিয়ে দেখতে পায় নীলচে আলো ঢুকেছে বাসের ভেতর। আতুর ঘর থেকে মাত্র বের হয়েছে সকালের সূর্যটা। সুপ্তীর ঘুম ভেঙেছে অনেক আগেই। ঠিকঠাক হয়ে সে বসে আছে পাশে। এরই মাঝে ঠোটে লিপস্টিক দিয়েছে! গালে পাউডারও মাখিয়েছে অল্প।

সুপ্তীকে দেখে ভালো লাগে। ভালো করে দেখে সে মেয়েটাকে। মনে পড়ে গতকালের ঘটনাটা। মাথা গরম ছিলো প্রদীপের। কারন ছাড়াই মেরেছে সুপ্তীকে। খেয়াল ছিলোনা মেয়েটার ভেতর তার বাচ্চা। রেগে গেলে হুশ লোপ পায়। কাকে মারছে, কেন মারছে এসব খেয়াল থাকেনা।

পাউডারের আড়ালে স্ত্রীর গাল কেঁটে বসে যাওয়া চড়ের দাগ দেখে এই মুহূর্তে খারাপ লাগতে থাকে। মেয়েটা পাউডারের ভারী প্রলেপ দিয়ে চড়ের দাগ লুকানোর চেষ্টা করেছে। গালে আলতো করে একটা চুমু খায় সে। চুমু খায় কাঁটা ঠোটে। আদর পেয়ে সুপ্তী আরও জড়িয়ে ধরে প্রদীপকে। ছোট্ট একটা বাচ্চার মতন বুকে মুখ লুকায়। বাসভর্তি লোক। জেগে আছে সবাই। প্রদীপের হঠাৎ একটু লজ্জাই লাগে। সে সুপ্তীকে হাত দিয়ে দূরে সরিয়ে দেয়। তারপর ব্যাগ ট্যাগ গুছিয়ে নেমে পড়ে সবার সাথে।

বুড়িমারি দিয়ে চ্যাংড়াবান্ধা হয়ে ভারতে ঢোকে লোকজন। চব্বিশ ঘন্টা বাস আসা যাওয়া করে এ পথে। মানুষের ভীড় লেগেই থাকে। খোলা থাকে খাবারের দোকান আর হোটেলগুলো। বোকাসোকা মানুষদের টাকা হাতিয়ে নেবার জন্য ঘোরাফেরা করে দালালরা।

'আন্ধারতো যায়নাই ঠিকমতন। কই যাবা অখন?' প্রদীপের সাথে হাটতে হাটতে কথাটা বলে সুপ্তী।

হাতে তার রাজ্যির ব্যাগ। এত ব্যাগ আনতে নিষেধ করলেও সে শোনেনি। বলেছে, 'মেয়েদের কোথাও গেলে কাপড়চোপড় একটু বেশি নিতে হয়।' ঝামেলার ভেতর এসব নিয়ে আর কথা বাড়ায়নি প্রদীপ।

'দেহি থাহনের কি ব্যবস্থা। বর্ডার পার হমু কহন। কহন কি করতে হইবো কিছুই বুঝতেছিনা!' প্রদীপ বলে এবার। তাকে খুব চিন্তিত মনে হয়। হাটতে হাটতে সুপ্তীর কাছ থেকে ব্যাগগুলো নেয় সে । মেয়েটার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। এদিক ওদিক ঘুরে কিছু সময় পরেই থাকার একটা ব্যবস্থা করে ফেলে প্রদীপ। সাথে তার টাকা আছে। একটা খুনের জন্য ভালো অঙ্কের টাকা নেয় সে। তাছাড়া এবার বড় দাও মেরেছে। সুপ্তীও সাথে করে কিছু গহনা নিয়ে এসেছে। বিপদের কথাতো আর বলা যায়না!

টাকা থাকলে সব পাওয়া যায়। রোজিনা পরিবহনের লোকেরাই থাকার জন্য একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দেয়। জানায় পরদিন সকাল এগারটার দিকে বর্ডার পার হবে সবাই। পাসপোর্ট আর ট্রাভেল ট্যাক্সের জিনিসপত্র রেখে দেয় তারা। তিনশ ডলার এনডোর্স করিয়েছে প্রদীপ। বাকিটা বাংলা টাকা আছে সাথে। ওপাড়ে গিয়ে রুপি করিয়ে নেবে সব।

ঘরে ঢুকেই গোসলটা সেরে নেয় সুপ্তী। তারপর ব্যাগগুলো আবার নতুন করে গোছায়। বাইরে থেকে পরোটা, ডাল আর সুজী আনা হয়েছে। খেয়ে নেয় দুজন। নিষেধ করবার পরও এটো প্লেট ধুতে বসে যায় সুপ্তী। কয়েকটা ময়লা কাপড় ধুয়ে শুকোতে দেয় জানালার গ্রিলে। মেয়ে মানুষের এই এক যন্ত্রনা। ছোট্ট একটা কামড়া পেলেই সংসার পেতে বসে। প্রদীপের বিরক্ত লাগে। বিরক্তি চেঁপে চুপচাপ শুয়ে থাকে বিছানায়। অস্ত্রটা রাখে বালিশের নিচে। কাজ সেরে দরজা-জানালা আটকে বিছানায় আসে সুপ্তী। ঘুমিয়ে পড়ে অল্প সময়ের মাঝেই।

প্রদীপের ঘুম আসেনা। নানান ভাবনা আসে মাথায়। এইতো গতকালই এমন সময় বরিশালের কাটপট্টি রোডে এক দোকানের চিপায় বসে মাল খাচ্ছিল সে। বিদেশী মাল। ওস্তাদ নওরোজ শাহের ছেলে ব্যাংকক না কই থেকে রয়েল স্ট্যাগ নিয়ে এসেছে। সেই জিনিষ বিলি করেছে কাছের মানুষদের মাঝে। বিদেশী মদ নিয়ে রাতভর ফূর্তি হয়েছে। মেয়ে মানুষও ছিলো। আগের দিন বিপক্ষ দলের কয়েকটা ছেলের মাথা ইট দিয়ে থেতলে দেওয়া হয়েছিল। জয়ের আনন্দে সবাই প্রায় বেহুশ ছিলো তাই।

সকাল হবার কিছু আগে যখন বাসায় ফিরবে সে তখনই ফোন আসে নওরোজ শাহের। বলা হয় এমপি সাহেবকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার জন্য। ওস্তাদের কথা শুনে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো প্রদীপের। এমন আদেশ আসতে পারে কখনও ভাবেনি। দ্রুত বাইক নিয়ে সে চলে যায় নথুল্লাবাদ। গিয়ে কথা বলে কয়েকজন শ্রমিক নেতার সাথে। বুঝতে পারে এ ব্যাপারে তাদেরও সায় আছে। সবকিছু আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে নওরোজ শাহ। নথুল্লাবাদে প্রদীপের সাথে এসে যোগ দেয় জাহিদ আর মোবাশ্বির। এই লাইনে ইদানীং ভালো করছে ছেলেদুটো। দুজনেরই বয়স কম, রক্ত গরম। প্রথমেই এত বড় কাজের ভার তাদের দেওয়াটা ঠিক হয়নি বলে মনে হয় প্রদীপের। অল্প সময় পরেই ডিম ভাজা আর রুটি খেয়ে তিনজন মিলে চেঁপে বসে বাইকে। সাথে থাকা কাটা রাইফেল আর রিভলবারটা নেয় কাগজ দিয়ে পেঁচিয়ে।

ব্রাউন্ড কম্পাউন্ডে বাড়ি এমপি সাহেবের। সূর্য ওঠার সাথে সাথে তিনি বের হন বাইরে। ডায়াবেটিস এর কারনে হাঁটাহাঁটি করেন। সাথে দুজন পুলিশ থাকে সবসময়। কয়েকজন শিষ্যও পাশে পাশে দৌড়ায় এমপির সাথে। ছয়টার দিকে বাইক নিয়ে পৌছে যায় প্রদীপ, জাহিদ আর মোবাশ্বির। দোকানপাট খুলতে শুরু করেছে। মানুষজন নেমে এসেছে রাস্তায়। দ্রুত কাজ সারতে হবে। সার্কিট হাউজের সামনে একটা দোকানে গিয়ে দাড়ায় তারা। ঠান্ডা খায়। প্রচন্ড রোদ। শরীর দুর্বল লাগে। সাড়ে ছয়টা নাগাদ হাঁটতে হাঁটতে সার্কিট হাউজের সামনে চলে আসে এমপি। বুক বরাবর প্রথম গুলিটা ছোড়ে প্রদীপ। সাথে সাথে রাস্তায় পড়ে যায় লোকটা। তারপর এলোপাথাড়ি গুলি করে রাস্তা ফাঁকা করে মোবাশ্বির। তার গুলিতে মারা পড়ে দুই পুলিশ।

এমপির শিষ্যরা খালি হাতে ছিলোনা কেউ। তাদের সাথে অস্ত্র থাকবে সেটা আগেই ধরে নিয়েছিলো প্রদীপ। তাই সাথে আরো কিছু লোক আনার ইচ্ছে ছিলো তার। নওরোজ শাহ্ না করেছে।

শিষ্যরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। বাইক স্টার্ট দিয়ে রেখেছিলো জাহিদ। কাজ সেরে দ্রুত বাইকে ওঠে প্রদীপ আর মোবাশ্বির। বাইক টেনে চলে যায় সোজা দোহারিকা। পুলিশদের বলা ছিলো আগে থেকেই। চলার পথে কেউ থামায়নি তাদের। দোহারিকা গিয়ে এলাকার কাঠমিস্ত্রী সুলতানের বাড়িতে ওঠে সবাই। শিষ্যদের ছোড়া গুলি পায়ে লেগেছিলো প্রদীপের। সুলতানের বাড়িতে এসে বাইক থেকে নামতে না নামতেই বেহুশ হয়ে পড়ে সে।

জ্ঞান ফেরার পর জানতে পারে নওরোজ রায়ের নির্দেশে বাইক নিয়ে ঢাকার পথে রওনা হয়েছে জাহিদ আর মোবাশ্বির। গুলি লেগেছে বলে তাকে ফেলে রাখা হয়েছে এখানে। নওরোজ শাহ ফোনে জানিয়েছে সুপ্তি আসছে। একটা মাইক্রো পাঠানো হয়েছে। সেই মাইক্রোতে করে সেদিনই প্রদীপ আর সুপ্তিকে নিয়ে আসা হয় ঢাকা। পাসপোর্টের ঝামেলা মিটিয়ে উঠিয়ে দেওয়া হয় বুড়িমারি দিয়ে ভারত যাবার বাস রোজিনা পরিবহনে। তাড়াহুড়োয় ভালোমতন চিকিৎসা হয়নি প্রদীপের। মাইক্রোতে করে ঢাকায় আসার পথে যাওয়া হয়েছিল হাসপাতালে। পুলিশি ঝামেলার ভয়ে চিকিৎসা করতে চায়নি কেউ। এক নার্স গুলি বের করে ড্রেসিং করেছে। এতটুকুনই।

ব্যাথা কমানোর ওষুধ সাথে নিয়েছে প্রদীপ। ব্যাথা কমেছেও কিন্তু কেন জানি রক্ত পড়াটা বন্ধ হচ্ছেনা ঠিকমতন। গত দুই দিনের এই হুজ্জোতের স্মৃতি চোঁখে ভাসে তার। কি থেকে যে কি হয়ে গেল! ভাবতে ভাবতে চোখে একটু ঘুম আসে। সামনের দৃশ্যগুলো ঝাপসা করতে করতে প্রচন্ড ক্লান্তিতে বুজে আসে চোঁখদুটো। ঘুম আর অন্ধকারে ডুবে যায় প্রদীপ।

হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। প্রথমে আস্তে তারপর জোরে জোরে। মাত্র আসা ঘুমকে বিদায় জানিয়ে লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসে প্রদীপ। বালিশের নিচ থেকে বের করে রিভলবারটা। সুপ্তি চিৎকার দিয়ে ওঠে। ইশারায় সুপ্তিকে থামতে বলে প্রদীপ কথা বলা শুরু করে।

'কে' কাঁপা কাঁপা গলায় কথা বলে সে।

'পুলিশ। চেক হবে। দরজা খোলেন।' ওপাশ থেকে বাজখাই গলায় বলে কেউ একজন।

'কিসের চেক।'

'কিসের চেক দরজা খুললেই না বুঝবেন। খুলেন।'

প্রদীপের মন খারাপ হয়ে যায়। সুপ্তি প্রায় শব্দ না করেই কাঁদতে থাকে। এতদূর এসে পুলিশের হাতে ধরা পড়বে এমনটা কল্পনাও করেনি সে। নওরোজ শাহের ওপর বিশ্বাস ছিলো। কঠিন বিশ্বাস। কাজ হলোনা। একটা রিভলবার দিয়ে একজন মানুষ লড়ে টিকতে পারবে না পুলিশের সাথে। তাছাড়া সাথে সুপ্তি আছে। ধরা দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। প্রদীপ রিভলবারটা আবার বালিশের নিচে রেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় দরজার দিকে। পুরুষ মানুষ হয়েও তার চোঁখে কেন জানি জল চলে আসে। সুপ্তির পেটের বাচ্চাটার জন্য তার বড় মায়া। মায়ার দুনিয়া খুবই খারাপ। শুধুমাত্র মায়ার কারনেই প্রদীপ মনে প্রানে চায় দরজার ওপাশে যেন পুলিশ না থাকে। কিংবা থাকলেও যেন তাদের ধরতে না আসে। নওরোজ শাহ্ প্রায়ই বলেন, 'আশাই সব। বেবাক মানুষ আশায় বাঁচে। অলৌলিক কিছুও ঘইটা যাইতে পারে আশার কারনে। কাওরই আশা ছাড়া উচিত না।' কথাগুলো মনে করে আশায় বুক বাঁধতে ইচ্ছে করে। প্রদীপ আশা করে। আশা করে সব ঝামেলা কেটে বের হয়ে যাওয়ার। আশা করতে দোষ নেই। কোন দোষ নেই। প্রদীপ তাই বোকার মতন আশাই করে। আহারে, বোকা প্রদীপ!

২.

২৭ জুলাই, ২০০৮ : ফুরায় আলো

লাশটা ছিলো ছোবহান মেয়ার পুলের পাশে।

সেখানে থাকার কথা ছিলোনা। এমপি সাহেবেকে গুলি করবার সময় নওরোজ শাহের আরো কিছু লোক ছিলো সেসময়। প্রদীপরা পালাবার পর লোকগুলো লাশটা তুলে নেয় গাড়িতে। দূরে নিয়ে ফেলে দেয় খালে। মাথাটা কেটে নেওয়া হয়। তারপর ফেলা হয় ডাস্টবিনে।

মাথা ছাড়া লাশ ভাসতে ভাসতে চলে আসে ছোবহান মেয়ার পুলের দিকে। লাশ প্রথমে চোখে পড়ে এলাকার রিকশাওয়ালা বাবুলের চোখে। লাশের শরীরে দামী কাপড় দেখে বাবুল প্রথমেই বুঝতে পারে এটা এমপি সাহেবের লাশ। ততক্ষনে পুরো শহর জেনে গেছে এমপি সাহেবকে মারা হয়েছে। লাশ পাওয়া যাচ্ছেনা। কেউ সাহসও

পাচ্ছিল না লাশ খোঁজার। নানান উড়ো খবর ভাসছিলো বাতাসে। পুলিশ থানায় চুপচাপ বসে ছিলো। মানুষজন টিভি অন করে অপেক্ষা করছিলো নতুন কোন খবর পাবার আশায়। কিন্তু লাভ হচ্ছিল না।
দুপুর বারোটার পরও রাস্তাঘাট ফাঁকা ছিলো। অফিস কামাই দিয়েছিল অনেকে।
দুপুরের অনেক পরে, বিকেলের ঠিক আগে আগে লাশটা দেখে লোকজনকে জানায় বাবুল। এ ধরনের খবর ছড়াতে সময় লাগেনা। বিকেল নাগাদ সবাই জেনে যায় লাশ পাওয়ার কথা। তারপর শুরু হয় ভাঙচুর। নথুল্লাবাদে বাস পোড়ানো হয়। নতুন বাজারের দোকানগুলোয় চলে লুটপাট। বন্ধ করে দেওয়া হয় স্কুল, কলেজ। শহরে থেকে থেকে বোমার আওয়াজ শোনা যায়। বিএম কলেজের সামনে চাপাতি, রামদা নিয়ে মহড়া দেয় এমপির দলের লোকজন।
শহরে যখন এসব চলছে তখন নাতির সাথে বসে টিভিতে ডোরেমন দেখছিলেন নওরোজ শাহ। তার বড় মেয়ের ছেলে। তার কলিজার টুকরা। এই সময় তাকে কেউ বিরক্ত করেনা। নাতির সাথে কাটানো সময়ে তার ঝামেলা ভালো লাগেনা। আজকের কথা ভিন্ন। তাই নওরোজ শাহকে বিরক্ত করবার সাহস পায় তার সবচেয়ে কাছের লোক জাহাঙ্গীর।
'শহরের অবস্থা খারাপ।' নওরোজ শাহের ঘরে এসে কাঁপা কাঁপা গলায় কথাটা বলে জাহাঙ্গীর। বোঝা যায় এই মুহূর্তে দারুন ভীত সে।
'ভয় পাইছস?' টিভি থেকে চোখ না সরিয়েই কথা বলেন নওরোজ শাহ।
'পাইছি। অল্প। অবস্থা একটু বেশিই খারাপ। এমুন দেখি নাই আগে।'
'হুম। এমপিরে সবাই ভালোবাসে মনে হইতেছে। কাজ অবশ্য খারাপ করে নাই ছেলেটা । অনেক উন্নতি করছে রাস্তা ঘাটের।'
'জ্বি। ম্যালা ভক্ত তার।'
কথা বলার ফাঁকে বাড়ির কাজের মেয়ে মালা এসে নিয়ে যায় নওরোজ শাহের নাতিকে। টিভি বন্ধ করে আরাম করে সোফায় বসেন নওরোজ শাহ। তারপর কথা বলেন জাহাঙ্গীরের সাথে।
'ফুটাইতেছে কারা?'
'এমপির লোকজন। চ্যাংড়া পোলাপাইন সব। ছাত্র। দৌড়ানি দিবো?'
'না। ভাঙাভাঙি করতে দেও। ভাঙাভাঙি দরকার। এমপি সাহেবরে নিয়া মানুষের আবেগটা বোঝা দরকার।'
'সবচাইতে ঝামেলা বিএম কলেজের দিকে। আমাগো দুইটারে কোপাইছে।'
'কারে কারে?'
'নজরুল আর জয়নালরে। নজরুলরে বেশি কোপ দিছে।'
'হাসপাতালে নিছো?'
'জ্বি।'
'দেইখো চিকিৎসা যেন ঠিকঠাকমতন হয়।' চোখ বন্ধ করে কথা বলেন নওরোজ শাহ। দেখে মনে হয় কিছু ভাবছেন তিনি।
'সাহস দিলে কিছু বলতে চাই ওস্তাদ।'
'দিলাম সাহস। বলো।'
'দৌড়ানি তো দেওয়া দরকার। মান ইজ্জত থাকেনা নইলে। আদেশ দ্যান।'
'মান ইজ্জত থাকার ব্যাপার নিয়া আমি ভাববো। তোমার চিন্তিত হওয়ার দরকার নাই। লাশ পাইছে?'
'ছোবহান মেয়ার পোলের কাছে ভাইসা উঠছে।'
'মাথা?'
'পায় নাই।'

‘পাওয়ার ব্যবস্থা করো। মাথা ছাড়া দাফন তো হবেনা। অনেক কথা বলছি। এখন শরবত দিতে বলো।’
একটানা কথা বলবার পর নওরোজ শাহকে ক্লান্ত মনে হয়। সপ্তাহখানেক হলো তার ক্যান্সার ধরা পড়েছে। ক্যান্সারের কারনে অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন তিনি।
ক্লান্ত নওরোজ শাহ সময় নিয়ে পেপের শরবত খান। বিকেলের নাস্তা বুট আর মুড়ি খেয়ে তার একমাত্র ছেলেকে কল দেন। ছেলে ঢাকার প্রাইভেট মেডিকেলে ডাক্তারি পড়ছে। তিনি আরাম করে কথা বলেন। কথা শেষে জরুরী কয়েকটা ফোন দেন। তারপর নিজের ঘরে যান। যাবার পথে ড্রাইভারকে বলেন গাড়ি বের করতে। নিজের ঘরে গিয়ে দেখা হয় স্ত্রীর সাথে। মাগরিবের নামাজ শেষ করে পান খাচ্ছিল মহিলা।
‘এমপি নাকি নাই?’
‘হ। মারা গেছে। কাপড় পাল্টাতে পাল্টাতে কথা বলেন নওরোজ শাহ।’
‘খুব দরকার ছিলো মারার?’ পিকদানিতে পিক ফেলতে ফেলতে বলেন কথাটা।
‘দরকার ছিলো।’
‘পুলাডা ভালো আছিলো।’
‘বেশি ভালো ভালো না।’ কাপড় পড়ে স্ত্রীর সাথে বলা কথার ইতি টেনে বের হয়ে যান নওরোজ শাহ।
গাড়ি বের করা হয়েছে চারটা। অস্ত্র নিয়ে নওরোজ শাহের লোকজন উঠে বসে তিনটা গাড়িতে। জাহাঙ্গীরকে নিয়ে নিজে একটা গাড়িতে বসেন তিনি।
আকাশের অবস্থা ভালো না। জোর বাতাস বইছে। মেঘগুলো সব একসাথে জড়ো হয়ে সলাপরামর্শ করছে কি সব! ধূলো উড়ছে পথে। ঝড় হবে। এখন কালবোশেখির সময়। প্রায় বিকেলেই ঝড় আসে। ঝড় আসলেই সন্ধ্যের দেখা পাওয়া যায়না আর। বিকেলের পরই আচমকা নেমে আসে রাত। গাড় অন্ধকার।
গাড়ির কাঁচ উঠিয়ে দিয়ে ড্রাইভারকে গান ছাড়তে বললেন নওরোজ শাহ। ‘মুজকো পানি পিলা দি জিয়ে...মুজকো শরবত পিলা দি জিয়ে।’ গান শুনতে শুনতে মাথা নাড়াতে লাগলেন তিনি। চোঁখ বন্ধ করে মাথা নাড়াতে নাড়াতেই জাহাঙ্গীরের সাথে কথা বলেন তিনি।
‘কলেজের দিকে অবস্থা কি বেশি খারাপ?’
‘জ্বি। তাই অন্য পথ দিয়া যাইতেছি।’
‘দাফন কাফনের কি অবস্থা?’
‘আইজ কবর দিবোনা। এমপি সাহেবের মেঝ ভাইতো ঢাকায়। ছোট ভাই প্লেনে কইরা রওনা দিছে ঢাকায়। মেঝ ভাই আসলে পরে ডিসিশান হইবো কই আর কোথায় কবর দিবো।’
‘কোন ঝামেলা য্যান না হয় দেইখো। সবকিছু ঠিকঠাকমতন হওয়া চাই।’
‘ঝামেলা নাই। পুলিশ পোস্টমর্টেম এর পর লাশ দিয়া গেছে। এখন ক্লিয়ার সব। দলের লোকজন লাশ নিয়া মিছিল করতে চাইছিলো। কিন্তু এমপির বউ রাজি না।’
‘আযম সাহেব আসতেছে?’
‘পৌছায় গেছে এমপির বাসায়।’
‘সন্দেহ করে না যেন কেউ খেয়াল রাইখো। আর আজকে গুরুত্বপূর্ন কারা কারা আসতেছে আমারে লিস্টি দিবা।’
‘দেবো।’
‘প্রদীপ শেষ খবর জানো?’
‘আপনার কথামতন মাইক্রোতে করে সুপ্তিরে পাঠানো হইছে। এতক্ষনে মনে হয় রওনা হয়ে গেছে ইন্ডিয়ার পথে। জাহিদ, মোবাশ্বির গেছে ঢাকার দিকে। ঝামেলার মধ্যে ফোন দিয়া কারো খবর নিতে পারি নাই।’
‘প্রদীপের বউ কিন্তু পোয়াতী। খেয়াল রাইখো পোলাটার।’ বলেন নওরোজ শাহ।

এমপির বাসায় যেতে দেরি হয়না খুব একটা। বাসা কাছেই। তাছাড়া রাস্তাঘাট ফাঁকা। একটু পর পর শুধু লাঠি নিয়ে দু-একজন লোকজন দেখা যায়। হুযুগে লোকজন সুযোগ পেয়ে ভাঙচুড়ের লোভ সামলাতে পারেনা। নওরোজ সাহেব এসেছেন এই খবর পাঠানো হয় বাড়ির ভেতরে। অস্ত্র নিয়ে কিছু লোক এসে দাড়ায় গাড়ির চারপাশে। অনেকটা সময় পর ভেতরে ঢোকার অনুমতি পায় নওরোজ শাহ। অনুমতি না দিয়ে উপায় নেই। এ শহরে টিকতে হলে তাকে তোয়াজ করেই চলতে হবে। তাছাড়া এই শোকের সময় ঝামেলা করবার মানে হয়না। বাড়ির সামনের লনে রাখা হয়েছে লাশ। নওরোজ শাহ লাশের পাশে গিয়ে দাড়ান। সবাই জানে নওরোজ শাহ আর এমপির ভেতর দা-কুমড়া সম্পর্ক ছিলো। এখন এসব নিয়ে কেউ তোলার সাহস পায়না। শোকের মাতম চলছে লাশ ঘিরে। এমপির বুড়ি মা একটু পর পর জ্ঞান হারাচ্ছে। স্ত্রী ডাক ছেড়ে কেঁদে যাচ্ছে। তার সাথে তাল মিলিয়ে কাঁদছে এমপির কলেজ পড়ুয়া মেয়ে আর কয়েকজন মহিলা। নওরোজ শাহ কাঁদেন। দেখানোর জন্য কান্না নয়। অন্তর থেকে আসা কান্না। এমপির সাথে সম্পর্ক এক-দুই দিনের নয়। অনেক অনেক দিনের। কান্না আসাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। নওরোজ শাহ নরম মনের মানুষ। কাছের মানুষদের শোকে তিনি কাতর হবেন এটাই স্বাভাবিক। ঘরের দু-একজন মানুষের সাথে কথা বলেন তিনি। যে বাড়িতে মানুষ মরে সে বাড়িতে রান্না নিষেধ। তিনি বাড়ি থেকে খাবার পাঠানোর কথা বলেন। গরমের ভেতর কে যেন তরমুজ কেটে দিয়ে যায়। বেআক্কেল সন্দেহ নেই। শোকের সময় খাবার ছুঁয়েও দেখেন না নওরোজ শাহ। গুরুত্বপূর্ন কয়েকজন লোকের সাথে কথা বলে আলো থাকতে থাকতে বের হন তিনি।

এখনও সন্ধ্যে নামেনি। বাতাসে কারনে ধূলো উড়ছে রাস্তায়। ঝড় আসতে দেরি নেই বোঝা যায়। না পড়ার মতনই ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়ছে। গরমটা কেটে যাবে এবার। রাস্তার ধূলোও দূর হবে।

গাড়িতে উঠেই কাঁচ উঠিয়ে দেন নওরোজ শাহ। এসি অন করেন। তার পেছনের গাড়িতে কয়েকজন সাংবাদিক আছেন। রাতে একসাথে খাবেন তারা নওরোজ শাহের বাসায়।

‘গাড়ির পথ ঘোরাও। ড্রাইভারকে বলো বিএম কলেজ দিয়া যাইতে।’ জাহাঙ্গীরকে বলেন তিনি। কেন জানি এই মুহূর্তে তাকে দেখে খুব নির্ভার মনে হয়।

‘বি এম কলেজের দিকে তো ঝামেলা।’ চিন্তিত জাহাঙ্গীর বলে।

‘যা বলছি তাই করো। অই দিক দিয়া পথ কম। তাড়াতাড়ি বাড়ি যাবো আমি।’

‘তাইলে কিছু পোলাপানরে ফোন দিয়া থাকতে বলি অইদিকে। সিচুয়েশান ভালো না। আপনের ওপর হামলা হইতে পারে।’

‘নওরোজ শাহের ওপর এমপির লোকজনের হামলা। ব্যাপারটা বড় অমানবিক হবে কি বলো? হা হা।’ কথাটা বলে নওরোজ শাহ হাসতে থাকেন।

জাহাঙ্গীর অবাক হয়। নওরোজ শাহ লোকটাকে সে বুঝতে পারেনা। তার হয়ে কত লোক কাজ করে, কারা করে, তার ব্যবসার খবর কোন কিছুই ঠিকমতন জানা নেই তার। অথচ সে’ই কিনা নওরোজ শাহের সবচেয়ে কাছের লোক! লোকটা কারো কাছে সবকিছু পুরোপুরি বলেন না। রহস্যময় একটা মানুষ। আর তাই হয়তো জাহাঙ্গীর তাকে এত শ্রদ্ধা করে। তার জন্য জীবন দিয়ে দিতে পারে।

বি এম কলেজ পৌছাতেই গাড়ি আটকে দেয় ডজনখানের ছেলে। কারা এরা চেনেনা জাহাঙ্গীর। অস্ত্র নিয়ে বের হতে নিষেধ করে নওরোজ শাহ। রাস্তায় টায়ার পোড়ানো হয়েছে। ছেলেগুলো নওরোজ শাহকে দেখেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। বোঝা যায় তাদের ওপর হামলা ঠেকানো যাবেনা। ভাঙা হবে গাড়ির কাঁচ, হেডলাইট সব। জাহাঙ্গীর কিছু একটা করতে চায়। পেছনে তিনটা গাড়িতে থাকা লোকজন নিয়ে খুব সহজেই এদের তাড়িয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু নওরোজ শাহ অনুমতি দেননা। তিনি অপেক্ষা করতে বলেন। নওরোজ শাহের ঠিক ডানপাশের জানালার কাঁচে হকি স্টিক দিয়ে বাড়ি মারে এক ছেলে। টুকরো টুকরো হয়ে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে কাঁচ। বিদেশি গাড়ির এত কম মজবুত কে জানতো আগে!

নওরোজ শাহ মুচকি মুচকি হাসেন। পাশে বসে জাহাঙ্গীর ছটফট করে। কাঁচ ভাঙ্গার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। নওরোজ শাহ জাহাঙ্গীরকে বলেন, 'কাঁচ ভাঙার শব্দ শুনতে মন্দ না কি বলো?'
জবাব দিতে যাবার ঠিক আগেই জাহাঙ্গীর টের পায় শরীরে হকি স্টিকের স্পর্শ। তীব্র ব্যাথা ছড়িয়ে পড়ে নিমিষেই। তার পরের আঘাতটা মাথায়। চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। সে দেখতে পায় ড্রাইভারকেও মারা হচ্ছে। দেখতে পায় চাপাতি দিয়ে নওরোজ শাহকে কোপানোর চেষ্টা করছে এক ছেলে। জাহাঙ্গীর ভয়ে চোখ বন্ধ করে। তার ভয় খুব বেশি। ভীতু জাহাঙ্গীর নওরোজ শাহের শরীরের রক্ত দেখতে চায়না। শ্রদ্ধেয় মানুষটার রক্ত দেখবার আগে মরে যাওয়া ভালো। মরে যাওয়াই ভালো।

৩.

২৭ জুলাই, ২০০৮ : অন্য পথে

মেয়েটা স্যাভলন খেয়েছে।
হাসপাতালে পার্টিটা জমছে না আজ। জয়নাল সাহেবের মন ভালো নেই। ঝা চকচকে সুন্দর একটা দিনে মন খারাপ হবার কথা না!
সামনে টেবিলের ওপর লালবাগ রয়্যালের কাচ্চি, জাফরান-বাদামের শরবত, চিকেন টিক্কা আর লাবান রাখা আছে। জয়নাল সাহেবের প্রিয় খাবার। এই মুহূর্তে তিনি এসব ছুঁয়েও দেখছেন না।
মূত্রনালীতে সমস্যা আছে তার। প্রসাবের বেগ হয় একটু পরপর। জয়নাল সাহেব বাথরুমে যান। প্রসাবের ঝামেলা শেষ হবার পরেও কমোডের ওপর বসে থাকেন অনেকক্ষন। বয়সে হচ্ছে বোঝা যায়।
আজকে ছুটির দিন। সপ্তাহে একটি দিন জয়নাল সাহেব নিজের মতন করে কাটান। ঠিকাদারির ব্যবসা তার। দু'হাতে টাকা কামান। ভাই এমপি। নিজ এলাকায় সরকারী সব কাজের টেন্ডার নিজেই পান। ব্যবসা নিয়ে ভাবনা নেই খুব একটা তাই। তার চেহারা ভালো। নাকটা সামান্য একটু বোঁচা। নাকের কারনে চেহারায় চাইনিজ ভাব চলে এসেছে। এ নিয়ে অবশ্য জয়নাল সাহেবের দুঃখ নেই। তিনি শরীরের ভালো খেয়াল রাখেন।
নিয়মিত জিমে যান। মেনিকিউর, পেডিকিউর, হারবাল ফেসিয়াল করান। শরীরে লোম উঠান। কয়েকদিন পরপর ডাক্তারের কাছে গিয়ে চেকআপ করান। তার বন্ধুর হাসপাতালে চেক আপ ফ্রি।
এই হাসপাতালে তিনি ছুটির দিনে আড্ডা দিতে চলে আসেন। হাসপাতালে তার জন্যে দুটো ঘর আলাদা করে সাজানো হয়েছে। আরাম আয়েশের সব কিছুই আছে এ ঘরে। ছুটির দিনে তিনি বাড়ি ফেরেন দেরি করে। বন্ধুর তৈরি এই হাসপাতালেই কাটান বেশিক্ষন। কেউ সন্দেহ করেনা। বাসার বউ ভাবে তিনি চেকআপ করানোর জন্য এসেছেন। বউ তার বোকা আছে। বোকা বউয়ের স্বামীর জীবন বড় আনন্দের।
জয়নাল সাহেবের জীবনও আনন্দের। কিন্তু ইদানীং উটকো সব ঝামেলা লাইফটা এলোমেলো করে ফেলছে। তার অফিসের রিসিপসনিষ্ট মেয়েটা স্যাভলন খেয়েছে। খবরটা সকালে পেয়েছে সে। বিশ্বস্ত কর্মচারী দিয়ে এই মেয়েকে

ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করানো। স্যাভলন অল্প খেয়েছিলো। ডাক্তার ওয়াশ করাতেই সব ঠিক। তবে মেয়েটার শরীর নাকি দূর্বল। হাসপাতালের বেডে বসে কান্নাকাটি করছে খুব।
মেয়েটাকে নিয়ে মাঝে মাঝে হাসপাতালে আসত জয়নাল সাহেব। তার মদ, বিড়ি খাওয়ার বাজে অভ্যাস নেই। কিন্তু সুন্দরী মেয়েদের দেখলে মন দূর্বল হয়। এই মেয়ের বিয়ে হয়েছে। বাচ্চা আছে।
জয়নাল সাহেব নিশ্চিন্ত মনে তাই সম্পর্কে জড়িয়েছেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই মেয়ে জয়নাল সাহেবের প্রেমে পড়েছে। কঠিন সমস্য। জয়নাল সাহেব মেয়েকে বুঝিয়েছেন। চাকরির ভয় দেখিয়েছেন। মেয়ে কিছুতেই মানছেনা। এতদিনে জয়নাল সাহেব বুঝতে পেরেছেন রিপা নামের এই মেয়েটি গভীর জলের মাছ। সামনের দিনগুলোতে এই মেয়ে আরো অনেক ঝামেলা করবে। এই মেয়ের সাথে সম্পর্কের ঘটনা কোনমতেই বাইরে ছড়িয়ে পড়তে দেওয়া যাবেনা।
বাথরুম থেকে বের হয়ে ক্লান্ত, বিদ্ধস্ত জয়নাল নিজের বিছানায় চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকেন। ঘরের ভেতর গান বাজছে। তিনি গানের কথাগুলো মনযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করে। কিছুক্ষন শুনতে না শুনতেই হাসপাতালের এক লোক এসে জানায় তার ছোট ভাই আরাফাত এসেছে। অপেক্ষা করছে। যে অল্প কয়েকজন তার এখানে বিশ্রাম করবার কথা জানেন তার মধ্যে আরাফাত একজন। তারা তিন ভাই। আরাফাত সবার ছোট। বড় ভাই এমপি। বড় ভাইয়ের সবকিছু দেখাশোনা করাই আরাফাতের কাজ। ছাত্র রাজনীতি করে এলাকায় ভালো জনপ্রিয় এখন সে। গান বন্ধ করে জয়নাল সাহেব ভাইকে ভেতরে ডেকে এনে বসান। বিছানা থেকে উঠে সোফায় পাশাপাশি বসে কথা বলেন।
'বড় ভাইজান নাই।' কথাটা বলে ফুঁপিয়ে একটু কাঁদে আরাফাত। এই ছেলে বড় ভাইয়ের ন্যাওটা খুব।
'জানি আমি। সকালেই খবর পাইছি। টিভিতেও দেখাইতেছে।' ছোট ভাইয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে স্বান্তনা দিতে দিতে বলেন জয়নাল সাহেব। ভাইয়ের জন্য তার কান্না আসেনা। এমনটা হবে তার আগেই জানা।
'ভাইজান একটা সিগ্রেট ধরাই। টেনশান হইলে সিগ্রেট না খাইলে মাথা ধরে আমার আজকাল।'
'খা। এসিটা বন্ধ করে নিস।'
'সকালের ফ্লাইটে আসছি। নওরোজ শাহ ঘটাইছে এই ঘটনা। দাফন-কাফনের জন্য যাইতে হবে বরিশাল। প্রথমে বাসায় গেছিলাম আপনার। ভাবিরে বলছি জামাকাপড় গুছায়ে রেডি হইয়া থাকতে। আপনার বাসা থেইকা সরাসরি এইখানে আসছি। অফিসে আর ফোনে না পাইয়া বুঝলাম এইখানেই আছেন।' সিগারেট ধরিয়ে খেতে খেতে এক নাগাড়ে এতগুলো কথা বলে আরাফাত।
'টিকিট কাটা আছে?'
'হ। কইরা রাখছি। এইগুলা কোন বিষয় না। ভাবিয়ে নিয়া ড্রাইভাররে এয়ারপোর্ট যাইতে বলি। আপনি এইখান দিয়াই রওনা দেবেন।'
'আমার জিনিষপত্তর?'
'সব ভাবি গোছগাছ কইরা নেবে। আপনার চিন্তা নাই।'
জয়নাল সাহেব আর কথা বাড়ায়। ছুটির দিনে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তিনি ফোন বন্ধ রাখেন। আজ আর আরাম আয়েশ কিছুই হলোনা। মুখ ভার করে ফোন অন করে তিনি কয়েক জায়গায় ফোন করেন। তারপর লিফট্ দিয়ে নিচে নেমে গাড়িতে উঠে বসেন।
'আপনার রিসিপসনিষ্ট নাকি হাসপাতালে?' গাড়িতে উঠে কথা বলে আরাফাত।
'হুম। কে কইলো' কথাটা শুনে জয়নাল সাহেবের কপালে সূক্ষ চিন্তার ভাজ পড়ে। চোখ ছোট হয়ে যায়। তার অফিসের রিসিপসনিষ্ট এর কথা আরাফাতের জানার কথা উচিত না। এসব কাজ তিনি সবার আড়ালে করেন। তার অফিসের দুজন কর্মচারী ছাড়া আর কেউ জানেনা।

‘ড্রাইভার কইলো। এইসব কাজ ক্যান করেন? ভাবি কি পরহেজগার, ভালো একটা মহিলা। ওনার সাথে বেঈমানি করা কি ঠিক?’ মুচকি হেসে কথাটা বলে আরাফাত। ভাইয়ের গোপন কথা জেনে দারুণ আনন্দিত সে বোঝা যায়।
‘তোমার এইসব নিয়া ভাবতে হবেনা। খুনটা কে করছে বলো?’ আরাফাতের কথা শুনে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় জয়নাল সাহেবের। প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য তিনি খুন নিয়ে আলোচনা শুরু করেন।
‘প্রদীপ আর নতুন দুইটা ছেলে।’
‘কই এরা এখন জানো?’
‘প্রদীপরে নাকি ইন্ডিয়া পাঠাই দিছে নওরোজ শাহ। আর দুইটার খবর জানিনা।
‘খোজ নাও। ভাইয়ের মৃত্যুর বদলা না নিলেতো মান ইজ্জত থাকবেনা। যাই হোক, ভাবীর কী অবস্থা?
‘অবস্থা ভালো না। আমি দেইখা আসছি কানতে কানতে বারবার বেহুশ হই যাইতেছে। আমি তো দুপুরের ফ্লাইটে চইলা আসছি। তারপরের খবর আর জানিনা। শুধু শুনছি নওরোজ বাড়িতে আসছে ভাইয়ের লাশ দেখতে। যত্তসব নাটক।’ মেজাজ খারাপ করে কথাটা বলে আরাফাত।
‘ভাবী শক্ত মানুষ। সামলায় নিতে পারবে। এখনতো আবার নির্বাচন হইবো। ভাবী এমন অবস্থায় নির্বাচনে যাইতে তো পারবেনা। তারতো অভিজ্ঞতাও নাই। কি কও তুমি?’
কথার জবাব দেয়না আরাফাত। মেঝ ভাইজান চালাক আর স্বার্থপর মানুষ। বড় ভাইর সাফল্য তাকে যন্ত্রনা দিত। তিনি বড় ভাইকে পছন্দ না করলেও তার কাছ থেকে সবরকম সুযোগ সুবিধা নিতেন। মারা যাওয়ার পর একদিন পার হতে না হতেই নির্বাচন নিয়ে কথা বলার ব্যাপারটা একদম ভালো লাগেনা আরাফাতের। সে ফোন নিয়ে ব্যস্ত হবার ভান করে। এর মাঝে ফোনও আসে। ফোনের ওপাশের মানুষটার কথা শুনে হ্যা, আচ্ছা, ঠিক আছে এই তিনটা কথা বলে ফোন রেখে সে মেঝে ভাইয়ের সাথে কথা বলে।
‘নওরোজ শাহ হাসপাতালে। আমাগো পোলাপান নাকি হামলা করছে। তেমন কিছুই হয় নাই তার। তবে সাথে থাকা ড্রাইভার কোপ খাইছে দুইটা।’ খবরটা শুনে উত্তেজিত আরাফাত বলে এ কথা।
আরাফাতের মুখে কথাটা শুনে অবাক হয় জয়নাল সাহেব। একটু যেন এলোমেলো লাগে ব্যাপারটা। জয়নাল সাহেব ঠান্ডা মাথার মানুষ। তাই সহজে উতলা হননা। ব্যাপারটা নিয়ে সময় নিয়ে ভাবতে হবে।
এয়ারপোর্টে পৌছে কিছুক্ষন অপেক্ষা করেন জয়নাল সাহেব আর আরাফাত। তারা পৌছানোর একটু পরেই জয়নাল সাহেবের বউ তহুরা আর কলিজার টুকরা মেয়ে সাদিয়া চলে আসে।
সাদিয়ার বয়স ষোল। চেহারা বেশি রকমের সুন্দর তার। এরই মাঝে ভালো ভালো জায়গা থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসা শুরু করেছে। বাবার আদর পেয়ে মেয়ে বেয়ারা হয়ে উঠেছে। সারাদিন বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা, এখানে সেখানে খেতে যাওয়াই সাদিয়ার একমাত্র কাজ। বাবার অঢেল টাকা। মেয়ের পেছনে খরচ করতে আপত্তি নেই। সাদিয়া এ সুযোগটা তাই ভালোমতই নেয়। যখনই টাকার প্রয়োজন হয় বাবার কাছে গিয়ে একটু আহ্লাদ করলেই সব সমস্যার সমাধান।
পরিবার নিয়ে প্লেনে উঠে পড়ে জয়নাল সাহেব। দেশের ভেতর চলাচল করা এসব প্লেন একদম পছন্দ না তার। প্লেনের ভেতরে জায়গা কম। লোকাল বাসের মতন গায়ে গায়ে সিট বসানো। খাবারও তেমন ভালো দেয়না। এক প্যাকেট বিস্কুট, আমস্বত্ত আর এক টুকরো ভ্যানিলা কেক। অবশ্য বিশ কিংবা ত্রিশ মিনিটের যাত্রায় এর চেয়ে ভালো খাবার আশা করাও বোকামী। জয়নাল সাহেবের মেজাজ বিগড়ে যায় এখানকার এয়ার হোস্টেসগুলো দেখলে। কড়া মেকআপ নেয়। বদখত চেহারার মেয়েগুলো উগ্র পোশাক পড়ে প্লেনের এমাথা থেকে ওমাথায় ঘুরে বেড়ায়।
প্লেন ছাড়বে। সবাইকে বসার অনুরোধ করা হয়। বলা হয় ফোন বন্ধ করতে। বউয়ের পাশে বসে জয়নাল সাহেব। সাদিয়া বসে তার ছোট চাচার পাশে। জয়নাল সাহেব ফোনটা বন্ধ করবার জন্য হাতে নেয়। ঠিক এমন সময়েই ম্যাসেজ আসে একটা। দোনামোনা করতে করতে ম্যাসেজটা চেক করে জয়নাল সাহেব। হাতে সময় কম। প্লেনের

চাকা ঘুরতে থাকে। এক এয়ারহোস্টেস পাশে এসে দাড়িয়ে ফোন বন্ধ করবার তাগাদা দেয়। দ্রুত জয়নাল সাহেব দেখে নেয় ম্যাসেজটা রিপার পাঠানো। ম্যাসেজটা ওপেন করতেই চোখে পড়ে লেখাটা। জয়নাল সাহেবকে এলোমেলো করে দেবার মতন লেখা। রিপা লিখেছে 'আই অ্যাম প্রেগনেন্ট। প্লিজ হেল্প মি।'
প্লেন আকাশে ওঠে। ভাসে বাতাসে। মেঘ ধরবার জন্য ব্যাকুল হয় প্লেন। জয়নাল সাহেব পাশে তাকিয়ে দেখেন বউ তহুরার চোখ তার ফোনের স্ক্রিনের ওপর। ধীর-স্থির জয়নাল সাহেবের বুকটা কেঁপে ওঠে। মাটি থেকে আকাশে, অনেক ওপরে উঠে এবার কেঁপে ওঠে।

৪.

২৮ জুলাই, ২০০৮ : হলুদ রোদ

মাঝে মাঝে মরে যেতে মন্দ লাগেনা।
জলপাইগুড়িতে গরম খুব। খুন করবার পর পার হলো একদিন। ব্যস্ত রাস্তায় ট্যাক্সিতে করে যাচ্ছে প্রদীপ আর সুপ্তি। সাথে আছে নওরোজ শাহের লোক অরবিন্দ।
গরম এত বেশি যে মনে হচ্ছে গলে যাবে রাস্তার পিচ। রাস্তার দু-পাশে গাছপালা কম। দেদারসে বিক্রি হচ্ছে লেবুর শরবত। বাসের চেয়ে তিন চাকার অটোরিকশায় করে বেশি মানুষ যাতায়াত করতে এদিকে। মেয়েরাও নেমেছে কাজে। কাজের জন্যে ছোটা মানুষের ভীড়ে মেয়েদের আধিক্য দেখে মনে হয় খুব সহজেই তারা টেক্কা দেবে ছেলেদের সাথে।
জলপাইগুড়ির বেশিরভাগ মেয়েদের গায়ের রং কালো। গরম আর রোদের কারনে মনে হয়। শাড়ি পড়েই চলাফেরা করে রাস্তায়। প্রদীপ মনযোগ দিয়ে দেখে মেয়েদের। একটা বড় অংশের মেয়েদের তলপেট উচু। নাভির অনেক নিচে শাড়ি পড়ে মেয়েগুলো। বেঢপ পেট আর ময়লা নাভি দেখে বিরক্ত লাগে প্রদীপের। চোখ ফিরিয়ে নেয় সে। তারা চরিত্র খারাপ না। তবে মাঝে মাঝে এসব দেখলে দোষ নেই। পুরুষদের জন্য এসব জায়েজ!
সূর্য নেমে এসেছে যেন ভূমির কাছাকাছি। গায়ে তাপ টের পাওয়া যায়। প্রদীপের এই পাগল করা রোদটা ভালো লাগে। এই হলুদ রোদে মন উচাটন হয়। সেই ছোট্টবেলায় পুকুরে পাগলের মতন ডুবোডুবি শেষে লাল চোখ নিয়ে ছোট্ট কচুপাতার আচ্ছাদন চোখের সামনে রেখে তাকিয়ে থাকত সূর্যের দিকে। মধুর সব দিন। তখনই প্রদীপ শিখেছিল কিছুক্ষনের জন্য মরে যাওয়া খেলাটা। অনেক ভীড়ের ভেতর, অনেক ব্যস্ততা, দুশ্চিন্তার ভেতর নিশ্বাস বন্ধ রেখে মটকা মেরে শুয়ে থাকার মধ্যে আনন্দই অন্যরকম। সব ঝুটঝামেলা কিছুক্ষনের জন্য ভুলে থাকা যায়। প্রদীপ তাই মাঝে মাঝে মরে যায়। মরে যাওয়া খেলা খেলে।
গাড়ির জানালার কাঁচটা খুলে মটকা মেরে শুয়ে থাকে প্রদীপ। শুরু করে মরে যাওয়া খেলা। গায়ে এসে আছড়ে পড়ে হলুদ রোদ। জীবন সুন্দর!

একটা বয়সের পর চাইলেও সবকিছু থেকে দূরে চলে যাওয়া যায়না। নানান ভাবনা ইচ্ছেমতন মাথায় আসে আর যায়। অস্ত্রটা নেই সাথে। ভয় ভয় লাগে প্রদীপের। জিনিষটা সাথে থাকলে সাহস পাওয়া যায়। অস্ত্রটা ফেলে আসা হয়েছে বুড়িমারির এক ডোবায়। পুলিশ এসেছিল হোটেলের ঘরটা চেক করতে। প্রদীপ ভয় পেয়েছিল। ভেবেছিল তাকে ধরতেই এসেছে বুঝি। ভাবনায় ভুল ছিলো। বুড়িমারির হোটেলগুলোতে প্রায়ই আসে পুলিশ। দেখে যায় বর্ডার দিয়ে কোন অবৈধ কিছু ঢুকছে কিনা। বর্ডার দিয়ে প্রচুর ভারতীয় শাড়ি আর মোটর পার্টস আনা নেওয়া করা হয়। পুলিশ বখরা না পেলে প্রায়ই ঝামেলা করে। লোকদেখানো চেক করার কাজও চলে।

কোন ঝামেলা করেনি পুলিশ। এমনি এমনি ভয় পেয়ে প্রদীপ হোটেলের জানালা দিয়ে অস্ত্রটা ফেলে দিয়েছে পাশের ডোবায়। অবশ্য বর্ডার দিয়ে অস্ত্রটা নিয়ে ঢোকা ঝামেলারই হত। তখন ঠিক ঠিক ধরা পড়ে যেতে হত। তার চেয়ে আগে ফেলে দিয়েই ভালো হয়েছে। পুলিশ এসে এটা সেটা দেখে একটু পরেই চলে গিয়েছিল। হাফ ছেড়ে বেঁচেছে প্রদীপ আর সুপ্তি।

দশটা নাগাদ তার পার হয়েছে বর্ডার। টাকা ভেঙে রুপি করে নিয়েছে। ট্রান্সপোর্ট ট্যাক্স, ছবি তোলা, পাসপোর্ট এসব কাজ শেষ করেছে। বর্ডারের এদিকে অপেক্ষা করছিল অরবিন্দ। গাড়ি নিয়ে এসেছে সে। সেই গাড়িতে করেই এখন অরবিন্দের বাসায় যাচ্ছে প্রদীপ আর সুপ্তি।

অরবিন্দ নওরোজ শাহের হয়ে কাজ করছে দীর্ঘদিন। বরিশালেই থাকত সে। তাকে দিয়ে খুনখারাবি হয়নি। নওরোজ শাহ একটা মিষ্টির দোকান দিয়ে দিয়েছিল। তাই চালিয়েছে অনেকদিন। তার চেহারাটা সহজ সরল মানুষদের মতন। ভালো জামা-কাপড় পড়ালে দেখে ভদ্রলোক মনে হয়। নওরোজ শাহ মিষ্টির দোকান বন্ধ করে তাকে অন্য কাজে লাগালেন।

অরবিন্দ বর্ডার দিয়ে মোটর পার্টস আর অস্ত্র লুকিয়ে আনার কাজ শুরু করে। এ কাজে ভালোই উন্নতি করেছে সে। কাজ করতে এসে জলপাইগুড়ির এক মেয়ের সাথে প্রেম হয়ে যায় অরবিন্দের। বিয়ে করে এখানেই সংসার পেতেছে এখন। নওরোজ শাহ এসেছিলো অরবিন্দের বিয়েতে। প্রদীপ আসেনি। অরবিন্দের সাথে প্রদীপের তেমন কোন কথা হয়নি এর আগে। বোকা সোকা মানুষের সাথে প্রদীপের কাজ কি!

'কিছু খেয়ে নেই চলেন। পথ তো কম না।' প্রদীপের দিকে তাকিয়ে বলে অরবিন্দ। গাড়িতে এসি নেই। গরমের কারনে ঘেমে নেয়ে একাকার অরবিন্দ।

'আপনার বাসায় গিয়েই খেলাম না হয়। যেতে কি সময় লাগবে বেশি?' প্রদীপ মরে যাওয়া খেলাটা বাদ দিয়ে কথাটা বলে। অরবিন্দের কথা শুনে তার একটু হাসি পায়। উচ্চারনে কোলকাতার বাবুদের একটা টান চলে এসেছে।

'আমরা বাসায় গিয়ে খাবোনা। এইখানেই খাবো দাদা।' অরবিন্দকে বলে সুপ্তি। চোখের ইশারায় খাওয়া নিয়ে কিছু বলতে নিষেধ করে প্রদীপকে। নিশ্চয়ই অরবিন্দের বাসায় কোন ঝামেলা আছে। হয়তো বউটা দজ্জাল। নইলে এই ভরদুপুরে বাসা কাছে থাকতে কেউ বাইরে খাওয়ার কথা বলে!

'জ্বি সুপ্তি দি। এরমই হবে। যেরম বলবেন আপনি।' অরবিন্দ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। মাথা নিচু করে কথাটা বলে। মনে হয় লজ্জায় মরে যাচ্ছে।

প্রদীপ আর কথা বাড়ায় না। গাড়ি এসে থামে একটা মাঝারি মানের হোটেলে। খাসির মাংসের ঝোল দিয়ে রুটি খেয়ে তারা আবার গাড়িতে উঠে বসে। পনের মিনিটের ভেতর পৌছে যায় অরবিন্দের বাড়িতে।

ছোট্ট একটা বাড়ি অরবিন্দের। চার রুমের বাড়ি। দুটো রুম ভাড়া দেওয়া আর দুটো রুমে থাকে তারা। ঘরে ঢোকার পরেও অরবিন্দের বউ গা করেনা। সে একটা খাটের ওপর বসে বাচ্চাকে স্তন দেয়। চুকচুক করে দুধ খায় বাচ্চাটা। প্রদীপ আসার পরেও কাপড় দিয়ে স্তন ঢাকেনা অরবিন্দের বউ। ঘরে অন্য পুরুষ এসেছে এসব নিয়ে তার যেন মাথা ব্যাথাই নেই।

সুপ্তি যে কারও সাথেই অল্প সময়ের ভেতর ভাব জমিয়ে ফেলতে পারে। বৌদি, বৌদি বলে ভাব জমিয়ে ফেলে অরবিন্দের বৌয়ের সাথে। প্রদীপ বাথরুমে ঢুকে যায়। গোসল করে লুঙ্গি আর স্যান্ডো গেঞ্জি পড়ে বের হয় বাইরে। দেখে অরবিন্দের দজ্জাল বউ সবার জন্য লুচি আর আলু ভাজি করেছে। সুপ্তির দিকে তাকাতেই সে মুচকি হাসে। মেয়েটা পারেও!

প্রদীপ, সুপ্তি আর অরবিন্দ আবার খেতে বসে। খাওয়া শেষে প্রদীপ বারান্দায় গিয়ে সিগারেট ধরায়। ছোট্ট এক টুকরো বারান্দা। অরবিন্দও এসে যোগ দেয়। তার সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস আছে। ঘরে বউয়ের ভয়ে খেতে পারেনা। আজ বউয়ের মন ভালো। কুটুমের সাথে বসে একটা সিগারেট খেলে তাই দোষ নেই। প্রদীপের সিগারেট ফুরিয়ে এসেছে। অরবিন্দ লুকোনো জায়গা থেকে গোল্ড ফ্লেকের প্যাকেট বের করে একটা দেয় প্রদীপকে। প্রদীপ সেটা যত্ন করে রাখে।

'দেশের অবস্থা তো ভালো না। কঠিন কাজ করছেন মাইরি।'

'কঠিন আর রিস্কেরও।'

'তা ঠিক। তা ঠিক। এদিককার টিভি চ্যানেলেও এ নিয়ে নিউজ পাওয়া যাচ্ছে। এমপিরে মারা সহজ কথা তো না।'

'কঠিন কাজটা।' প্রদীপের এখন এসব নিয়ে কথা বলতে ভালো লাগেনা। সিগারেটটা সে শান্তি করে খেতে চায়।

'কোন দিকে যাবেন আপনারা? পরিস্থিতি ঠান্ডা না হওয়া পর্যন্ত তো দেশে ফেরা যাবেনা।'

'হ।' প্রদীপের কেন জানি খুব অসহায় লাগে। গর্ভবতী বউকে নিয়ে সে কই যাবে বুঝে উঠতে পারেনা। নওরোজ শাহ কখন কোন আদেশ দেবেন ঠিক নেই। কোথাও থিতু হবার উপায় নেই। নওরোজ শাহের ওপর রাগ হয় প্রদীপের।

'আমার বাড়ি নিরাপদ না। পুলিশের চোখ আছে। তাছাড়া কাজও তো করি ইলিগাল কাজ।' বলে অরবিন্দ।

'দেখি ওস্তাদ নওরোজ শাহ কি বলে। অস্ত্র আছে আপনার কাছে? আমারটা নিয়া বর্ডার পার হইতে পারি নাই।'

প্রদীপরা এসে অরবিন্দকে বিপদে ফেলে দিয়েছে বোঝা যায়। নওরোজ শাহ না বললে অরবিন্দ কখনই প্রদীপকে আশ্রয় দিতনা। একটা অস্ত্র দরকার। যেহেতু এসব আনা নেওয়ার কাজ করে অরবিন্দ তাই তার কাছেই চেয়ে বসে একটা।

'ম্যানেজ করে দেওয়া যাবে। কিন্তু নওরোজ শাহের পারমিশান লাগবে যে। বৈকালের দেরি নাই। আপনারা পৌছাইলে বরিশালে ফোন দিয়া জানানোর কথা।'

'ওস্তাদের সাথে আমার কথা আছে। ফোন এখনই দেন।' ফোনের কথা শুনে উতলা হয়ে ওঠে প্রদীপ। নওরোজ শাহকে তার অসহায় অবস্থার কথা জানানো দরকার। নিশ্চয়ই তিনি কোন একটা ব্যবস্থা করবেন।

সিগারেট খাওয়া শেষ হয় দুজনেরই। ঘর থেকে ফোনটা নিয়ে আসে অরবিন্দ। কয়েকবার চেষ্টার পর ফোন করা যায় বরিশালে। ফোনটা নেয় প্রদীপ। ওপাশ থেকে ফোন ধরে জাহাঙ্গীর। জানায় নওরোজ শাহ ঘুমাচ্ছেন। তার শরীর খারাপ। যতই জরুরী হোক ফোন দেওয়া যাবেনা। নওরোজ শাহের ছেলের নিষেধ আছে। বাধ্য হয়ে প্রদীপ জাহাঙ্গীরকেই সব সমস্যার কথা বলে। বোকা জাহাঙ্গীর কোন সমাধান দিতে পারেনা। আমতা আমতা করে শুধু। প্রদীপ রেগে গিয়ে ফোন অরবিন্দকে দেয়। অরবিন্দ তারপর বারান্দা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে সময় নিয়ে কথা বলে জাহাঙ্গীরের সাথে। কি এত কে জানে!

কথা শেষে অরবিন্দ প্রদীপের পাশে এসে বসে। তাকে মাথা ঠান্ডা করতে বলে। প্রদীপকে নিয়ে জোর করেই শহর দেখতে বের হয়। অরবিন্দ ভালো মটর সাইকেল চালায়। প্রদীপকে নিয়ে মটর সাইকেলে করে শহরটা চক্কর দেবার জন্য বের হয় সে।

‘চিন্তা করলে ঝামেলা আরো বাড়ে। কি লাভ?’ ক্যান্টনমেন্টের ভেতর দিয়ে যাবার সময় অযথাই হর্ণ দিতে দিতে কথা বলে অরবিন্দ। কথা শুনে প্রদীপের মেজাজ বিগরায় আরো। অরবিন্দের মত মানুষের কাছ থেকেও উপদেশ শুনতে হচ্ছে আজকাল। দিন খারাপ যাচ্ছে বলেই এমন হচ্ছে।
‘লাভ নাইতো।’ মুখ ভার করে বলে প্রদীপ। অরবিন্দের কথায় কান না দিয়ে ক্যান্টনমেন্টটা দেখতে থাকে প্রদীপ। সবগুলো বাড়ির রং একই। একটু পর পরই বাঙ্কার। যুদ্ধ হয়না এখন। তারপরও বাঙ্কারের কাজ কি বোঝেনা প্রদীপ। সে একসময় ছাত্র ভালো ছিলো। তখন আর্মিদের এসব নিয়ে ঘাটাঘাটি করা হয়েছে ভালোমতনই।
‘চলেন আমার দোকানে নিয়া যাই।’
‘দোকান আছে নাকি আপনার?’
‘মোটর পার্টস এর স্মাগলিং করি। একটা দোকান থাকলে সুবিধা হয়। লোকজন সন্দেহ কম করে আরকি। হে হে।’ কথা বলে হাসে অরবিন্দ। মোটর সাইকেলের গতি বাড়ায়।
‘দোকান কি দূরে?’
‘না কাছেই।’
কাছে বললেও মিনিট বিশেকের ভেতরেও দোকানের দেখা পাওয়া যায়না। ক্যান্টনমেন্টটা আকারে অনেক বড়। অনেক সময় লাগে এখান থেকে বের হতে। বিকেল শেষ হতে থাকে। একটু একটু করে আলো মরে যায়। পেছনে চুপচাপ বসে থাকে প্রদীপ। পায়ে ব্যাথা হচ্ছে হঠাৎ। গুলি লাগা পায়ের কথাটা ভুলেই ছিলো আজ সারাদিন। অনেকক্ষন পর দোকানে পৌছায় অরবিন্দ আর প্রদীপ। ছোট্ট একটা দোকান। ভেতরে সাজানো গোছানো না। প্রথম দেখায় অগোছালো একটা গ্যারেজ বলে মনে হয়। জায়গাটা নিরিবিলি। এমন জায়গায় দোকান করার কোন মানে হয়না বলে মনে হয় প্রদীপের। দোকানের ভেতর দুটো কিশোর কাজ করছে। জ্যাক দিয়ে পুরনো একটা মোটর সাইকেলের কিছু একটা খোলার চেষ্টা করছে তারা।
অরবিন্দ আর প্রদীপ দোকানের ভেতর ঢুকতেই তারা উঠে দাড়ায়। একজন দ্রুত ঝাপ বন্ধ করে। কেউ একজন জ্যাক দিয়ে মারে তার মাথায়। চোখের পলকেই হয় সব। মাথার ভেতরটা ফাঁকা হয়ে যায় প্রদীপের। টের পায় রক্তের একটা ধারা গড়িয়ে পড়ছে তার মাথা থেকে নিচের দিকে। পড়ে যেতেই অরবিন্দ ধরে তাকে। বারবার বলে সরি দাদা, সরি দাদা। তার ব্যাথাতুর মুখটা চোখে পড়ে। এই লোকের কষ্ট পাওয়ার কারন কি?
প্রদীপের এই সময় সুপ্তির কথা মনে হয়। সুপ্তির পেটের ভেতরে ছোট্ট একটা মানুষের কথা মনে পড়ে। চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে এক টুকরো জল। এই কষ্ট মাথায় পাওয়া ব্যাথার জন্য নাকি সুপ্তি কাছে নেই বলে করা হাহাকারের জন্য তা বোঝা যায়না। প্রদীপের চোখের সামনে সব ঝাপসা হতে থাকে। কানে আসে অরবিন্দের কথা, ‘সরি দাদা, সরি দাদা, সরি দাদা, সরি দাদা, সরি দাদা, সরি দাদা...।’ তারপর সব অন্ধকার।

৫.

২৮ জুলাই, ২০০৮ : নদীর জীবন

হাসপাতালের লিফট্ কাজ করেনা।
পাঁচ তলা থেকে কোলে করে নামানো হয় নওরোজ শাহকে। ক্যান্সারটা ভালো যন্ত্রনা দিচ্ছে। শরীর অনেক বেশি দুর্বল তার। লোকজনের ধারনা তার উপর যে হামলা করা হয়েছে তার কারনে তিনি হাসপাতালে আছেন। ধারনা

ঠিক নয়। সেদিনের হামলায় শরীরের কয়েক জায়গায় ছিলে গেছে শুধু। ঢাকা থেকে আনা হয়েছিল ছেলেগুলোকে। নওরোজ শাহই এনেছে। এদিকের কেউ নওরোজ শাহের গায়ে হাত তোলার সাহস পাবেনা। তাছাড়া এদিকের ছেলে হলে চিনে ফেলতে পারে। তাই পয়সা খরচ করে সবার অগোচরে এতগুলো ছেলেকে বরিশাল এনে রাখা হয়েছে। নওরোজ শাহ ছাড়া কেউই জানত না ব্যাপারটা। এখনও জানেনা। অইদিনই পয়সা দিয়ে ছেলেগুলোকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। যে কাজে আনা হয়েছিল সে কাজ ভালোমতনই শেষ হয়েছে।
সাংবাদিকরা লিখেছে প্রতিশোধপরায়ন হয়ে এমপির লোকজন নওরোজ শাহের ওপর হামলা করেছে। হামলার পর সাধারন মানুষের সহানুভূতিও পাওয়া যাচ্ছে। সব ঠিকঠাক মতন হচ্ছে। কিন্তু নওরোজ শাহ শান্তি পাচ্ছেন না। তার মন বলছে কোথাও ঘাপলা হচ্ছে। বড় কোন ঘাপলা।
হাসপাতাল থেকে নিচে নেমে গাড়িতে উঠে বসেন নওরোজ শাহ। পাশে তার স্ত্রী এবং নাতি। মেয়ে বসেছে পেছনের গাড়িতে। নওরোজ শাহের শরীর খারাপ শুনে তার ছেলে এসেছে ঢাকা থেকে। জয়নাল সাহেবরা যে প্লেনে এসেছেন সেই একই প্লেনে বরিশাল এসে পৌছেসে ছেলেটা। এসে দেখাশোনা করছে বাবার ।
গতকাল বমির সাথে রক্ত এসেছে। রক্ত দেখে বিচলিত হয়ে পড়েছে তার ডাক্তার। একটা দিন রাখতে চেয়েছিল হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতালে ফিনাইলের গন্ধে নওরোজ শাহের দম বন্ধ হয়ে আসে। তাই ডাক্তার দেখিয়ে, কয়েকটা টেস্ট করিয়েই বাড়ি ফিরছেন তিনি।
'গাড়ি নদীর দিকে নেও।' গাড়ির সামনের সিটে বসা জাহাঙ্গীরকে বলেন নওরোজ শাহ।
'বাসায় যামুনা?' অবাক হয়ে নওরোজ শাহের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলে জাহাঙ্গীর।
'এক কথা দুইবার বললে ক্লান্ত হয়ে যাই। কথার পিঠে কথা বলবানা সবসময়। শরীর খারাপ আমার জান নাকি?' জাহাঙ্গীরের কথায় বিরক্ত হয় নওরোজ শাহ। তার স্ত্রী কিছু বলেনা। সাহসও নেই। সবগুলো গাড়ি রওনা দেয় কীর্তনখোলার পাড়ে।
নদীর পাড়ে বাতাস খুব। মেঘলা আকাশ। অল্প কিছু ট্রলার দাড়িয়ে আছে একপাশে। মাটি কাটার কাজ করছে কিছু শ্রমিক। কয়েকটা নৌকার মাঝি গোসল সারছে নদীতে। কেউ আবার ভাত খাচ্ছে। দু-তিনটা বেদে মেয়ে নদীর জলে পা ডুবিয়ে বসে আছে। তাদের এলোমেলো শাড়ি আরও বেসামাল হয়ে পড়ছে বাতাসের কারনে।
নওরোজ শাহ নদীর পাড়ে এসে একটা টুলে বসেন। এদিকে একটু পর পর বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমপিই করেছিল এসব। চারপাশে একটু পর পর গাছ লাগানো হয়েছে। আছে বিজলী বাতি। সন্ধ্যে হলেই আলোকিত হয়ে যায় চারপাশ। বিকেল বেলা এদিকে লোকজন ঘুরতে আসে। অল্পবয়সী প্রেমিক, প্রেমিকারা ঘন্টা হিসেবে ভাড়া নিয়ে ছইওয়ালা নৌকায় নদীর এপার ওপাড় ঘুড়ে বেড়ায়। মাঝনদীতে গিয়ে ছইওয়ালা নৌকাগুলো থেমে থাকে। প্রেমিক প্রেমিকাকে আদর করে। চোখ নামিয়ে রাখে মাঝি। অল্প কিছু বেশি আয় হয় এতে।
দানবের মতন অনেকগুলো বড় বড় লঞ্চ দাড়িয়ে আছে। দ্বীপরাজ, সাগর সাত, সুরভী আরও কত বাহারী নাম লঞ্চগুলোর। একটু পরেই ভীড় বাড়বে। ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেবে লোকজন।
এই নদী, এই লঞ্চঘাট নওরোজ শাহের বড় প্রিয়, বড় আপন। পাকিস্তান আমলেরও আগে থেকে এই ঘাটে কেটেছে তার সময়। বাবা দর্জি ছিলো। লোক ভালো হলেও মদ খেতেন খুব। অভাব লেগেই ছিলো ঘরে। দিনের পর দিন না খেয়ে থাকতে থাকতে নওরোজ শাহ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। একদিন তাই সবার অগোচরে বাড়ি পালাল। এসে ঠাই হল লঞ্চঘাটে। তখন এসব কিছুই ছিলোনা। স্টীমারে করে ঢাকা যেত লোকজন। টানা একদিন লাগত যেতে। প্রথমে কোন কাজ জোটেনি নওরোজ শাহের। তবে কিছু বন্ধু জুটে যায়। গরীব, টোকাই বন্ধু। তারা খাবারের দোকানগুলোর পাশে ঘুরঘুর করত। একবার খাওয়া হত প্রতিদিন। প্রতি রাতেই পঁচা খাবার বাইরে ফেলত হোটেলের লোকজন। নওরোজ শাহ আর তার বন্ধুরা আলু আর মুরগীর হাড় মেশানো প্রায় গলে যাওয়া পঁচা সে ভাত জোগাড় করত। পঁচা বলে গন্ধ হত খুব। প্রচুর পরিমানে লবন মেশানো হত তাই। দিন শেষে প্রথমবারের মতন খাবার পেয়ে গোগ্রাসে গিলত তারা। এসব দিনের শেষ হয় যখন ঘাটের কাছেই একটা রুটির

দোকানে কাজ পায় নওরোজ শাহ। রুটির দোকানে তার মন বসেনি। বয়স তের-চৌদ্দতে যখন পড়ল শরীরের পেশিগুলো ধীরে ধীরে ফুলতে শুরু করছিলো। নিজের শক্তি টের পাচ্ছিলেন নওরোজ শাহ। রক্ত গরম বলে হুটহাট করে মেজাজ খারাপ হত। এমনি একদিন মেজাজ খারাপের সময় হোটেল মালিকের মাথা ফাঁটিয়ে দিলো নওরোজ শাহ। চাকরি ছেড়ে ফিরল পুরনো গরীব, টোকাই বন্ধুদের কাছে। কয়েকজন মিলে তৈরি করল একটা দল। ততদিনে সবাই নওরোজ শাহকে চিনে গেছে। জানে নিজের বাপকে মেরে আধমরা করে বের হয়েছে সে বাড়ি থেকে। সবাই তাই নওরোজ শাহকে ভয় করে। সমীহ করে। অপরাধের জগতে সেই শুরু নওরোজ শাহের। আর পেছনে ফিরে তাকায়নি সে।

মেঘগুলো সরে গেল হঠাৎ। আকাশ ফকফকা পরিস্কার। মনে হয় শরতের কোন এক বিকেলবেলা যেন। নওরোজ শাহ জাহাঙ্গীরকে ডাকেন। নাতিকে কোলে নিয়ে কথা বলেন জাহাঙ্গীরের সাথে।

'নৌকা ভীড়তে বলো। নদীতে ঘুরতে ইচ্ছা করতেছে।'

'আপনের তো মিটিং আছে। আযম সাহেবরে আসতে বলছিলেন সন্ধ্যার দিকে।' আস্তে করে বলে জাহাঙ্গীর। নওরোজ শাহের আজকের পাগলামিতে একটু যেন বিরক্ত সে।

'বড় যন্ত্রনা দেও তোমরা। আযম সাহেবরে এদিকে ডাকো। নৌকায় বসে মিটিং হবে। নৌকায় ঘুরতে ঘুরতে কথা বলবো।'

বাবার আজগুবি কথা শুনে ছুটে আসে নওরোজ শাহের ছেলে। বাবাকে বোঝানোর চেষ্টা করে। লাভ হয়না। নওরোজ শাহ কোনদিন কারও কথা শোনেননি। আজ কেন শুনবেন!

নৌকা আসে নদীর পাড়ে। শুধু নওরোজ শাহ, তার ছেলে, জাহাঙ্গীর আর নওরোজ শাহের নিরাপত্তার জন্য অস্ত্র নিয়ে নৌকায় ওঠে দুজন লোক। নাতি নৌকায় ওঠার বায়না ধরলেও প্রচন্ড স্রোতের ভেতর তাকে নিতে সাহস পায়না নওরোজ শাহ। কলিজার টুকরা নাতি তার। নাতিকে নিয়ে কোন ঝুকি নিতে রাজি নন তিনি।

নৌকা ছাড়তেই আযম সাহেবকে ফোন দেয় জাহাঙ্গীর। মাঝি ধীরে ধীরে বৈঠা বায়। কি সুন্দর কীর্তনখোলা। মুগ্ধ হয়ে চারপাশটা দেখতে থাকে নওরোজ শাহ। স্রোত খুব বেশি আজ। নৌকা দুলতে থাকে। একটু পর পর ভেসে যায় কচুরীপানা। ঠিকানা জানা নেই এমন কোন ঠিকানায়। ইশ, মানুষ যদি এমন পারত! পারেতো। মরে গেলেই হয়। মরে গেলে কই যাওয়া হয় সে ঠিকানা তো জানা নেই কারো। আজকাল নওরোজ শাহের মৃত্যুর কথা খুব মনে পড়ে। নিজের পরিচিত জগত ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার ব্যাপারটা তিনি মেনে নিতে পারেননা। তার খুব রাগ হয়।

'চা দেও। চা খাই একটু।' জাহাঙ্গীরের দিকে তাকিয়ে বলেন নওরোজ শাহ।

সাথে করে চা আনা হয়েছে। কামরুলের চা। এলাকায় বিখ্যাত। এই লোক নিউজিল্যান্ড এর একটি চা বানানোর প্রতিযোগীতায় গিয়েছিল। চা বানানোটাকে শিল্পের পর্যায় নিয়ে গেছে কামরুল। দুধের শর আর মধু দিয়ে যে চা সে বানায় তা খেয়ে মনে হয় বেহেশতী শরবত। প্রতি কাপ বিক্রি করা হয় পনের টাকা করে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জমজমাট থাকে তার দোকান।

এই চা নওরোজ শাহের পছন্দ। ফ্লাস্ক ভর্তি করে প্রতিদিন বাসায়ও চা আসে। জাহাঙ্গীরের দেওয়া চা খেতে খেতে নওরোজ শাহ নদীর নখরামি দেখেন। নদীর মাঝখানে একটু পর পর চর পড়েছে। আগের সেই জৌলুশ আর নেই কীর্তনখোলার।

'প্রদীপ জলপাইগুড়ি পৌছাইছে' নওরোজ শাহকে বলে জাহাঙ্গীর।

'ফোন দিছিল?'

'জ্বি'

'আমারে দিলানা ক্যান?'

'আপনি অসুস্থ তাই।'

‘তোমারে না বলছি যে অবস্থায়ই থাকি প্রদীপের ফোন আমারে দিবা? ছেলেটা কেমন আছে জানে দরকার। আমার জন্যেই সে পলায় বেড়াইতেছে। তার খেয়াল রাখাটা আমার দরকার। অরবিন্দের বাসায় আছে?’ ধমক দিয়ে বলেন নওরোজ শাহ।

‘সেইখান দিয়াই ফোন দিছিল। কথা ঠিকমতন বুঝি নাই। নেটওয়ার্কে ঝামেলা। দূরের পথ তো।’ ধমকের পর মাথা নিচু করে কথাটা বলে জাহাঙ্গীর।

‘পরেরবার ফোন দিলে আমারে দিবা। আর ছেলেদুইটা কই।’

‘অগো খবর পাইনাই। কলকাত্তা গ্যাছে মনে হয়। টাকা পয়সা যথেষ্ট দিয়া দিছেন। ভালোই আছে মনে হয়।’

‘তারপরও খোজ নিও।’ কথাটা বলে বৈঠা হাতে নেয় নওরোজ শাহ। মাঝির পাশে বসে ছিল সে। নৌকা বাইবার লোভ সামলাতে পারলনা। এটা তার অনেক পছন্দের কাজ। কিন্তু বেশিক্ষন বাইতে পারেনা। ক্যান্সারের ক্লান্তি থামিয়ে দেয়। বড় জোর আর তিন মাস কথা বলতে পারবেন নওরোজ শাহ। তারপর অপারেশন। বেঁচে থাকলে গলায় টিউব বসানো হবে। রাইল্স টিউব দিয়ে খেতে হবে খাবার। এর মাঝেই গলা ভেঙে গেছে তার। কুচকে গেছে চামড়া। চামড়ার নিচে জমাট বেঁধেছে পিন্ডের মতন রক্ত। এভাবে বেঁচে থাকতে ভালো লাগেনা তার। তিনি রাজার মতন বাঁচতে চান। নিজের মতন করে বাঁচতে চান।

নৌকা পাড়ে যায়। আযম সাহেব চলে এসেছেন। বাসা তার খুব দূরে নয়। বেল্স পার্কের পাশে। গাড়ি নিয়ে আসলে পাঁচ মিনিটের মতন লাগে। তিনি এ শহরের সবচেয়ে ধনী মানুষ। চারটে লঞ্চ তার। বৈধ, অবৈধ ব্যবসা রয়েছে আরও অনেক।

নওরোজ সাহেবের সাথে মিলে তিনি এমপিকে মেরেছেন। তার ব্যবসা নিয়ে ঝামেলা করছিল এমপি সাহেব। পথের কাটা দূর করাই তাই উত্তম মনে করেছেন। তার টাকা আছে কিন্তু লোকবল কম। এলাকায় তার জনপ্রিয়তা নেই বললেই চলে। তিনি এখন জনপ্রিয়তা বাড়ানোর দিকে নজর দিয়েছেন। প্রচুর দান-খয়রাত করছেন। মসজিদ-মন্দিরে টাকা দিচ্ছেন। প্রতি শুক্রবার লঙ্গরখানায় শ’খানেক মানুষকে খিচুরী খাওয়ান। তার টাকায় এলাকার নেতারা নির্বাচন করেন। এই শহরের হাল-হকিকত বদলানোর পেছনে তার অনেকটাই হাত আছে।

আযম সাহেব নৌকায় উঠে বসেন। তার মেজাজ চরম খারাপ। নওরোজ সাহেবের এ ধরনের আচরন তার একদম পছন্দের না। তিনি সন্মানিত মানুষ। তাকে এভাবে অপমান করবার মানে হয়না।

এই নওরোজ শাহ লোকটাকে তিনি একদম বুঝতে পারেন না। লোকটার প্রচন্ড সাহস। প্রচন্ড একগুয়ে আর জেদি এই লোক। এলাকায় জনপ্রিয়। তার কথা অমান্য করবে এমন লোক খুজে পাওয়া ভার।

লোকটা অহংকারী। কারও ধার ধারেন না। নিজের ব্যবসা নিয়ে নিজের মতন করে থাকেন। আযম সাহেব তাকে সমীহ করেন। কিন্তু সবকিছুর একটা সীমা থাকা উচিৎ। এই সময়ে নৌকার ওপর বসে তাকে মিটিং করতে দেখলে মানুষ পাগল ঠাউরাবে। নওরোজ শাহের কথা অমান্য করা ঠিক হবেনা বলেই তিনি এসেছেন। নইলে আসতেন না।

‘কি অবস্থা আযম সাহেব। মন মেজাজ ভালো?’ নদী দেখতে দেখতে বলেন নওরোজ শাহ।

‘জ্বি ভালো। মিটিং তো বাসায় করার কথা ছিলো।’ মেজাজা খারাপ করে বলেন আযম সাহেব।

‘কথা তো অনেক কিছুই থাকে। কিন্তু সেই কথা শুনে কয়জন।’ অন্য দিকে তাকিয়ে বলেন নওরোজ শাহ। বুকটা কেঁপে ওঠে আযম সাহেবের। তার এই কয়দিনের করা সব কাজের কথা কি জেনে গেলো লোকটা! ভয় হয়।

‘আমি তো কথা দিয়া কথা রাখি নওরোজ সাহেব।’

‘তাই। ভালো। বাদ দেন। নদীটা দ্যাখেন। কি সুন্দর। আজকের আবহাওয়াটা চমৎকার।’

‘জ্বি। উপনির্বাচন নিয়ে কি ভাবছেন?’ সময় নষ্ট না করে সরাসরি কথায় চলে আসে আযম সাহেব। নদী দেখবার মতন সময় তার নেই।

‘মাত্র তো এমপি মারা গেল। এত তাড়া কিসের?’

‘মনোনয়ন যারা চায় তাদের লিস্ট যাবে ঢাকায়। সরকারী দল কমিটি করবে। লবিং করবে। অনেক কাজ আছে। হাতে সময় নাই। আগে থেকে কে কারে সাপোর্ট দিবে এইগুলান ঠিক কইরা ফালান ভালো।’
‘মাঠ তো ফাঁকা। টেনশান নাই।’
‘আছে নওরোজ সাহেব। হালকা করে নেবেন না বিষয়টা। এমপির ভাই জয়নাল মনে হয় মাঠে নামবে।’
‘মাঠে নেমে লাভ হবেনা। টিকবে না।’
‘এমনটা মনে হইলো ক্যান আপনার?’
‘তার চরিত্র খারাপ। আকামের কাহিনী প্রমানাদি সহ হাজির করা যাবে। লোকজন এইসব বেশি খায়। ভোট পাবেনা।’
‘এমপির ছোট ভাইও রাজনীতিতে ভালো। যদিও ইলেকশান করবার বয়স তার হয় নাই। সমস্যা হইলো এমপির বউ দাড়াইলে মানুষের সিমপ্যাথী পাবে। ভোটে জেতা তার জন্যে ব্যাপার না।’ নৌকার পাটাতনে একটু আরাম করে বসে বলে আযম সাহেব। দুলতে থাকা নৌকা থেকে পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। এসবে ওঠা হয় অনেকদিন। আযম সাহেব তাই একটু ভয়ে ভয়ে থাকে।
‘ওয়ার্ড কমিশনাররা হাতে আছে। শহরের বেশির ভাগ নেতারেই পকেটে ঢোকানো হইছে। আমি টাকা ঢাললেই হবে। বাকিটা আমি দেখতেছি। মনোনয়ন কারে দিবো সেইটা আমার ভাবনা।’ ঢোক গিলে গিলে কথা বলেন নওরোজ শাহ। ক্যানসার হবার পর গলা শুকিয়ে যায় খুব দ্রুত। পিপাসা পায়। কষ্ট হলেও কথা বলেন নওরোজ শাহ।
‘পুরো বিষয়টা একা দেখলে তো হবেনা। ইনভেস্ট করবো আমি। আমাকেও বিষয়টা জানতে হবে। আপনার বয়স হয়েসে। শরীরও ভালো যাচ্ছেনা। আপনার ছেলে পড়তেছে ডাক্তারী। সে’ও এই লাইনে আসবে না। এই মুহূর্তে আপনি যদি সব বিষয় এমন হালকা করেন তবে আপনার সাথে থাকার ব্যাপারে আমাকে ভাবতে হবে।’
‘আমি এই শহরের ভালো মন্দ দেখি আযম সাহেব। ভালে মন্দের ব্যাপারে সিদ্ধান্তও খালি আমিই নিবো। এই ব্যাপারে অন্য কিছু হইলে আমার পাগলামীর শিকার হবেন। আমি একবার পাগলামী শুরু করলে অন্যদের ক্ষতি হয়। নিজের ক্ষতির ব্যাপারে সাবধান থাকবেন।’ এই পর্যন্ত বলে একটু থামেন নওরোজ শাহ। বড় করে নিশ্বাস নেন। তারপর আযম সাহেবকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন নদীতে।
সবকিছুই চোখের পলকে। উপস্থিত থাকা অন্যরা কে কি করবে কিছুই বুঝতে পারেনা। জাহাঙ্গীর ‘কি হইলো, কি হইলো।’ বলে চিৎকার করে। পানিতে স্রোত খুব। আযম সাহেবকে দেখা যায় একবার পানিতে ডুবে গিয়ে পরক্ষনেই আবার ভেসে উঠছেন। প্যান্ট, শার্ট ঝামেলা দিচ্ছে। সাতার দিতে পারছেন না। সাতার কি জানেন তিনি?
নওরোজ শাহ নৌকা ঘুরাতে বলেন। মাঝি কথা অমান্য করবার সাহস পায়না। তার মেজাজ ভালো।
আযম সাহেবকে নিয়ে ভাবছেন না। সামনেই চর আছে। যদি সাতার জানেন তবে সাতরে উঠবেন তিনি। আর না জানলে কাল থেকে এই শহরের গল্পটা আবার একটু অন্যরকম করে লিখতে হবে। এসব কিছুই না। এসব নিয়ে ভাবলে নওরোজ শাহের মতন মানুষের চলেনা।
তিনি দূরে পাড়ের দিকে তাকান। পাড় ধরে লাগানো কৃষ্ণচূড়া আর সোনালু ফুল চোখে পড়ে। আহ, কি সুন্দর! নদীর জলে হাত ভেজায় নওরোজ শাহ। তারপর মাত্র ঘটে যাওয়া ঘটনায় বিমূঢ় হয়ে থাকা ছেলের কাঁধে হাত রেখে বলেন,‘কে বলে নদীর জীবন নাই। বুঝলা নদীর জীবন আছে। মানুষের মতন জীবন আছে।’
ছেলের মাথায় এসব কিছু ঢোকেনা। সে ভয়ে কাঁপে। কাঁপতেই থাকে।

৬.

২৮ জুলাই, ২০০৮ : বন্দী খাঁচায়

গোরস্থান রোডে কবর দেওয়া হয়েছে এমপি সাহেবকে।
রাজ্যির মানুষ ভীড় করেছিল জানাযায়। কেঁদেছে পরিচিত অপরিচিত অনেকে। বাসাতেও কুরআন শরীফ পড়েছিল ডজনখানেক হুযুর। আত্মীয় স্বজন, নেতা-কর্মীদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভীড় কমেনি এখনও।
জয়নাল সাহেব বসে আছেন ড্রইংরুমে। টিভি দেখছেন। এখন দুপুর। ঘরে এসি লাগানো। জানালার পর্দাগুলোও নামিয়ে দেওয়া। এখানে বসে বাইরের রোদের আনাগোনার ব্যাপারে কিছুই বোঝা যায়না।
জয়নাল সাহেব একা একটু সময় কাটাতে চাচ্ছেন। একা হবার সুযোগ নেই। যারাই বাড়িতে আসছে তাদের সবার সাথেই কথা বলতে হচ্ছে। সবাই ঠিকমতন খাচ্ছে দাচ্ছে কিনা এসব তদারকি করতে হচ্ছে। বিরক্তিকর।
বাইরের কাউকে ভেতরে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। শসায় লবন মাখিয়ে আয়েশ করে খাচ্ছে জয়নাল সাহেব। টিভিতে মন নেই। অনেকগুলো বিষয় নিয়ে ভাবতে হচ্ছে তাকে। রিপাকে নিয়ে ভালো ঝামেলা শুরু হয়েছে। অপরাধ করা হলে মনের ভেতর কেন জানি ভয় ঢুকে যায়। প্লেনে বসে তার মোবাইলের স্ক্রিনের দিকে বউকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ভয়ই পেয়েছিল জয়নাল সাহেব। বেঁচে গিয়েছে সেদিন। বউ ম্যাসেজ পড়েনি। তার এসব নিয়ে মাথাব্যাথা নেই। তহুরা মোবাইল, কমপিউটার এইসব কঠিন জিনিষ নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে একদমই পছন্দ করেনা।
রিপার সাথে এরপর কথা হয়েছে। গর্ভপাতে রাজী নয় মেয়েটা। সে জয়নাল সাহেবের সাথে ঘর করতে চায়। এই চালাক মেয়ের মুখ বন্ধ রাখবার জন্য আপাতত কিছু টাকা পয়সা দেওয়া হয়েছে। তবে বেশিদিন এই যন্ত্রনা নিয়ে থাকা যাবেনা।

ওয়ার্ড কমিশনারদের সাথে একটা মিটিং করতে হবে। এমপির মৃত্যুর পর বেশির ভাগ নেতাই নওরোজ শাহের দলে যোগ দিয়েছে। তাদের সাথে কথা বলে বুঝতে হবে কাকে তারা এমপি হিসেবে দেখতে চায়। কিছু পয়সা বিলিবন্টনেরও ব্যাপার আছে। সবচেয়ে জরুরী হল শহরের ধনী মানুষ আযম সাহেবকে দলে ভেড়ানো। অনেকগুলো লঞ্চের মালিক হলেও তার আয়ের একটা বড় অংশ আসে মাদক ব্যবসা থেকে। কাশীপুরে প্রায়ই মেলা বসে। সেখানে যাত্রাপালার আয়োজন হয়। চারপাশটা টিনের দেয়াল দিয়ে ভেতরে অসামাজিক কার্যকলাপ চলে। অর্ধনগ্ন হয়ে নেচে গান গায় মেয়েরা। মদ, ফেন্সিডিল, গাজা বিক্রি হয় দেদারসে। পুলিশ কিছু বলেনা। আযম সাহেবকে কিছু বলার সাহস নেই কারও। এমপি সাহেব বলেছিল তাই তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। জয়নালের ভালোই হয়েছে এতে। সুবিধা হয়েছে। ভাইয়ের জায়গা নিয়ে নেবে এখন সে। আযম সাহেবের টাকাতেই নির্বাচন করে জনপ্রিয় হবার পর ভাইয়ের মতন আযম সাহেব অবৈধ কাজে বাগড়া দেবেনা কখনও। এত বোকা জয়নাল সাহেব নন।

সাদিয়ার চিৎকার শোনা যায়। ভাবনা বাদ দিয়ে মেয়ের চিৎকার শুনে বাইরে আসে জয়নাল সাহেব। সব কাজিনরা জড়ো হয়েছে। একসাথে হৈ-হুল্লোড় করছে। মৃত্যু এদের কাছে আনন্দ হয়ে এসেছে। বানরের খেলা দেখানো হচ্ছে। কে যেন ডেকে নিয়ে এসেছে। কেমন বেআক্কেল সব। একজন মানুষ মরে যাবার পর দুইটা দিন ফুরালো না অমনি সবাই আনন্দে মেতে উঠেছে। এসব কি! জয়নাল সাহেবের মেজাজ খারাপ হয়। তবুও তিনি কিছু বলেন না।

খাঁচার ভেতর বানরটার শরীরে মাংস বলতে কিছু নেই। এমন ছোট আকারের বানর দেখা হয়নি আগে কখনও। ছোট হওয়ার কারন জিজ্ঞেস করতেই পাশে থাকা একজন বলে, 'খাঁচার ভিতর আটকা থাকে সারাজীবন। চাইলেও বড় হওয়ার উপায় নেই।' জয়নাল সাহেবের মনে হয় শহরে থাকা মানুষগুলোর অবস্থাও বানরটার মতন। অদৃশ্য এক খাঁচায় বন্দী ইট-কাঠের ভেতর বসবাস করা শহরের মানুষরা চাইলেও ঘর ছেড়ে বের হতে পারেনা। শহরের, ব্যস্ততা, আর লোভ দিয়ে তৈরি বাতাসের খাঁচায় থাকতে থাকতেই পার হয়ে যায় এক জীবন।

কি যে হল জয়নাল সাহেবের! এসব কি চিন্তা করছে সে! মন ভালো নেই বলেই হয়তো এমন হচ্ছে। দুশ্চিন্তায় দুশ্চিন্তায় কাটছে সময়।

মৃত বাড়িতে চারদিন চুলা জ্বলবেনা। বাইরে থেকে খাবার আসবে। আজ দুপুরের খাবার পাঠিয়েছেন নওরোজ শাহ। রাজনীতিটা বুঝতে পেরেছেন জয়নাল সাহেব। বুড়ো লোকটার কাছে হেরে যেতে হচ্ছে বারবার। জনগন অতি বোকা। তাদের বোকা বানাতে ওস্তাদ নওরোজ শাহ। এমপি সাহেবকে খুন করে এখন সেই বাড়িতেই আবার খাবার পাঠিয়ে জনগনের কাছে ভালো হচ্ছে নওরোজ শাহ। এভাবে চলতে দেওয়া যাবেনা। কঠিন প্যাচ কষতে হবে। জনগনদের নিয়ে আসতে হবে হাতের মুঠোয়।

'জলদস্যু শাহ্ আলম এসেছে। ডাকবো তারে?' কাজের লোক এসে বলে।

জয়নাল সাহেব শাহ্ আলমকে ভেতরে আসতে বলেন। শাহ্ আলম সোফায় বসে। টিভি দেখতে থাকে। লেবুর শরবত আর চানাচুর দিয়ে যাওয়া হয়। শাহ্ আলম খেতে থাকে।

'কি অবস্থা শাহ্ আলম? দিন কাল কেমন যায়?' অল্প করে কাঁশি দিয়ে কথা শুরু করে জয়নাল সাহেব।

'জ্বি আছি আর কি। আপনাদের দোয়া।'

'জিনিষপত্তর এর কি অবস্থা?'

'জ্বি আছে অল্প কিছু। দুইটা স্পীড বোট, একটা ট্রলার, ডজনখানেক রামদা, চাপাতি, কাটা রাইফেল, রিভলবার আর দুইটা একে-৪৭ দিয়া চলতাছে। ২০ জনের দল। পটুয়াখালি, ভোলা নিজের দখলে আছে। তয় আগের মতন ব্যবসা নাই। লঞ্চ লুট কইরা তেমন কিছু পাওয়া যায়না। এইসব ছোড রুটে আগের মতন ভীড় হয়না। সব বাসে যাতায়াত করে।'

'বুঝলাম। সবই বুঝলাম।'

কথা বলার মাঝখানে সাদিয়া এসে ঘরে ঢোকে। বাবার পাশে বসে। পাতলা একটা টি শার্ট আর থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট পড়ে আছে মেয়েটা। জয়নাল সাহেব মেয়ের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারেন মেয়ে বড় হচ্ছে। শরীর বাড়ছে। শাহ্ আলম চোখ দিয়ে গিলছে সাদিয়াকে। জয়নাল সাহেব মেয়েকে ভেতরে যেতে বলেন। মেয়ে রাজী হয়না। জয়নাল সাহেব ধমক দেন। ধমকে কাজ হয়।

'তোমারে একটা লঞ্চ দিবো। দুই হালি একে-৪৭ পাবা আর সাথে ২০ লাখ টাকা। একটা বড় কাজ করতে হবে। পারবা?' শাহ আলমকে বলেন জয়নাল সাহেব। রিমোট দিয়ে টিভিটা বন্ধ করেন। এখন জরুরী আলোচনা। এসময়ে টিভির আওয়াজে ঝামেলা।

'জয়নাল ভাই, বাজারে আমার দাম বাড়ছে। ২০ লাখে আর পাইবেন না। আপনাগো ফয়দা হইবো কোটি টাকা আমারে দিবেন বিশ লাখ! ইনসাফ হইলো নাতো।'

'কাজটা শুন আগে।'

'কাজটা জানি জয়নাল সাহেব। অশিক্ষিত আছি কিন্তু বলদ না। এইসুম আমারে ক্যান ডাকছেন এইটা বোঝা কঠিন কিছু না। এলাকার সবচাইতে ধনী মানুষরে সাথে পাইতাছেন। ২০ লাখ এর জায়গায় ৫০ লাখ দেওয়া তার জন্যে ব্যাপারই না। আপনি আমারটা দেখলে আমি আপনারটা দেখবো। ঠিক বলছি না?'

হাতি গর্তে পড়লে চামচিকাও লাথি মারে। জয়নাল সাহেবের এখন লাথি খাবার সময়। তবে তিনি বিচলিত নন। তার সময় যখন আসবে তখন তিনি সবাইকে দেখে নেবেন।

'দেখি কথা বলে আযম সাহেবের সাথে। তার সাথে বসবো শীঘ্রই। তোমারও থাকা লাগবে তখন।' একটু গম্ভীর হয়ে কথাটা বলেন জয়নাল সাহেব। তার মেজাজটা কোনমতেই ভালো হচ্ছেনা।

শাহ্ আলমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি তার ঘরে যান। তহুরা ঘরে নেই। রান্নাবান্নায় ব্যস্ত হয়ত। বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে নিয়ে একটু চিন্তা হচ্ছে। এই মুহূর্তে সবাই চাইবে এমপি সাহেবের বউই নির্বাচন করুক। লোকজনের বাজে আবেগ। নিজের ভাবীকে বাগে আনতে হবে। এই মহিলা বুদ্ধিমতী। তার কোন দূর্বলতা নেই বললেই চলে। কিভাবে কি করা যায় মাথায় আসছে না। বিছানার পাশেই রাখা মোবাইলটা নিয়ে আযম সাহেবকে ফোন দেওয়া হয়। মোবাইল বন্ধ। শেষ মুহূর্তে না এই লোক নওরোজ শাহের হয়েই কাজ করে। এত টেনশান সহ্য করা যায়না। রিপা পাশে থাকলে ভালো হত। টেনশানের সময় মেয়েটা মাথায় বিলি কেটে দেয়। জয়নাল সাহেব রিপার বুকে ডুবিয়ে রাখে মুখ। বড় শান্তি লাগে। টেনশান উবে যায় নিমিষেই।

জয়নাল সাহেব নিজের ঘর থেকে বের হন আবার। বুক ধড়ফড় করে। ড্রইং রুমে দেখেন শাহ্ আলম বসে আসে। কথা বলছে এমপি সাহেবের বউয়ের সাথে। কি কথা? হয়ত স্বাভাবিক কিছু। কিন্তু জয়নাল সাহেবের মনে হয় কোথাও তাকে নিয়ে গভীর কোন ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তিনি বাড়ির বারান্দায় যান। হাটেন একটু। তাকে দেখে দৌড়ে আসে কয়েকজন কাজের লোক। কিছু লাগবে কিনা জানতে চায়। জয়নাল সাহেব তাদের বিরক্ত করতে নিষেধ করেন।

রিপার কথা ভাবেন। তিনি কঠিন মনের মানুষ। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে কাউকে কাছে পেতে ইচ্ছে করে। কারও বুকে মুখ লুকাতে ইচ্ছে করে। রিপা ছলাকলা জানে। তার বয়স হচ্ছে। এই সময়ে রিপার মতন কাউকে কাছে দরকার। তহুরা ঠান্ডা একদম। সাত চড়েও রা নেই। এমন মেয়েদের সাথে সংসার করা নিরাপদ। তবে এদের সাথে প্রেম জমেনা। জীবনে প্রেম না থাকলে আছেটাই কি? রিপার সাথে যদি পালিয়ে যাওয়া যেত দূরে কোথাও! জীবনে অনেক ক্ষমতা থাকলেও নিজের ইচ্ছেমতন সবকিছু করা যায়না। বড় অসহায় মনে হয় নিজেকে তখন। বাড়ির ভেতরে হঠ্যাৎ হৈ-হুল্লোড় শোনা যায়। চিৎকার শুনে জয়নাল সাহেবের ভাবনায় ছেদ পড়ে। তিনি দৌড়ে ভেতরে যান। গিয়ে শোনেন আরাফাত আর তহুরাকে এক ঘরে পাওয়া গেছে। তারা বাজে কিছু করছিল। প্রথম এটা চোখে পড়ে এমপি সাহেবের বউ আর শাহ্ আলমের। বাড়ির সব লোক ভীড় করেছে এখানে। জয়নাল সাহেব ভীড়ের মাঝে দেখতে পান সাদিয়ার চোখে জল। এলোমেলো কথাবার্তা শোনা যায় সবার। জয়নাল

সাহেবের মাথায় কিছুই ঢোকেনা। মাথাটা ফাঁকা হয়ে যায়। তিনি শাহ্ আলমের দিকে তাকান। বন দস্যুর মুখে হাসি। এমপি সাহেবের বউকেও নির্ভার মনে হয়। তাকে নিয়ে কি ষড়যন্ত্র হচ্ছে? মান ইজ্জত সব গেল। মুখে মুখে এই কথা ছড়াবে পুরো শহরে। সবাই বলবে জয়নাল সাহেব বউকে নিজের নিয়ন্ত্রনে রাখতে পারেন না। নিজের বউকে নিয়ে যে হিমশিম খায় পুরো শহর সে কিভাবে চালাবে? টেনশানে জয়নাল সাহেবের বুকের ধড়ফড়ানিটা বাড়ে। রিপাকে দরকার ছিল। রিপার বুকে মুখ লুকানো দরকার। শরীর ঘামে। মাথা ঘুরায়।
এত সহজে হারলে চলবে না। অন্য কেউ হলে জ্ঞান হারাত। তাতেই শান্তি। পালিয়ে বাঁচা যায়। কিন্তু জয়নালের এত অল্পতে ভেঙে পড়লে চলেনা। একটা জিনিষ ভালো হল। তহুরাকে তালাক দেওয়া যাবে। ঘরে আসবে রিপা। ষড়যন্ত্র যেই করুক সে অপকার করতে গিয়ে করেছে উপকার। ভালো হল। সময় এলে সবকিছুর হিসাব হবে। ক্লান্ত হয়ে ড্রইংরুমে এসে সোফায় বসেন জয়নাল সাহেব। ঝামেলা যা হোক ওদিকে। এতসব নিয়ে টেনশান করা যাবেনা। যে কোন একটা জিনিষ নিয়ে ভাবতে হবে। ইশ, এমন সময় যদি পাশে থাকত রিপা। সব মুশকিল আসান হয়ে যেত। রিপাকে দরকার। খুব করে দরকার। জয়নাল সাহেবের প্রেম হয়ে গেল নাকি?

৭.

২৯ জুলাই, ২০০৮: বরফ মানুষ

শ্রী চরণ রাই বসাক মাল খেতে চায়।
রাতের আকাশে মেঘের শেষ নেই। সেই অনেক অনেক মেঘের শরীর ফুড়ে বের হয়ে এসেছে বেশ কিছু তারা। এমন মস্ত আকাশ চোখে পড়েনা সচরাচর। কি দারুণ এই পৃথিবী। কি দারুণ বেঁচে থাকা।
ন্যাওড়া ভ্যালীর এক রেস্ট হাউসে বসে আছে প্রদীপ। ডুয়ার্স থেকে অনেক ভেতরের গভীর জঙ্গল। বিদ্যুৎ নেই। হ্যাজাক লাইট জ্বালানো হয়েছে গোটা দশেক। ঝিঝি পোকার ডাঁক কানে এসে লাগে। শেয়ালও জানান দিয়ে যায় তাদের কথা। কেমন রূপকথার মতন মনে হয় সবকিছু। ঘোর লাগা চারপাশ।
রেস্ট হাউজের সামনের মাঠটায় আদিবাসী মেয়েরা নাঁচছে। শরীরে কাপড়ের পরিমাণ তাদের সামান্যই। নাচের তালে তালে শরীরের এলোমেলো মাতলামি বুক কাঁপায়। কয়েকজন আদিবাসী পুরুষ ঢোল আর কি সব বাদ্যযন্ত্র বাজায়। ছাগলের বারবিকিউ হচ্ছে। দামী মদ, সিগারেট, কাজু বাদাম আর চিপস্ এর ব্যবস্থা আছে। রেস্ট হাউজে আসা অতিথিরা এসব খাবার নিয়ে ব্যস্ত। কেউ কেউ মাতাল হয়েছে ইতিমধ্যেই। এই সুযোগে একজনের বউ নিয়ে যাচ্ছে আরেকজন। মধ্যবয়স্ক বৌদিদের আজ পাগলামী করবার সুযোগ। বুড়ো মরদ ফেলে কচি কিছু ছেলের স্বাদ নেওয়া হবে এই রাতে। জঙ্গলে এসে নিয়ম কানুন মানার বালাই নেই! শহর, সমাজ পেছনে ফেলে আসা হয়েছে। নিয়মকে বুড়ো আঙ্গুল দেখানোর সময় এটাই। যে যা করুক ইচ্ছেমতন। বাঁধা দেবে কে?
সুপ্তি ঘুমিয়ে আছে। এত বড় ধকলের পর বিশ্রাম নেওয়া দরকার। মেয়েটা ক্লান্ত। একের পর এক দূর্ঘটনায় ভেঙে পড়েছে একদম। ভেঙে পড়েছে প্রদীপও। সবকিছু ওলটপালট হয়ে আছে। নওরোজ শাহ দেশে বসে কি করছে

বোঝা যাচ্ছেনা। দেশের সীমানা পাড় হবার পর থেকে তার সাথে আর কথা হয়নি। নওরোজ শাহের সাথে ফোনে কথা বলা দরকার। এভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে খুব বেশিদিন টিকে থাকা যাবেনা। কেউ একজন ষড়যন্ত্র করছে। নিজেদের মধ্যে কেউ একজন আছে যে বেঈমানী করছে। জাহাঙ্গীর এর সাথেও কথা বলা দরকার। অরবিন্দকে সে কি বলেছে জানতে হবে।

অরবিন্দ লোকটা ভালো। ছোটখাট অপরাধ করলেও মানুষ গুম করবার মতন অপরাধ করে তা হজম করবার সাধ্য নেই লোকটার। প্রদীপকে খুন করবার মতলব তার ছিলোনা। সে চেয়েছিল ভয় পাওয়াতে। কার হুকুমে এসব করছে এখানে আসার আগে কিছু বলেনি অরবিন্দ। লোকটা ভয় পাচ্ছিল খুব। প্রদীপকে বারবার বলছিল 'ক্ষমা দিয়েন। আমার হাত-পা বাঁধা। ওপরের হুকুম। নেপাল যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতেছি আপনাদের।'

কি থেকে কি হয়ে গেল বোঝা যায়নি কিছু। জ্ঞান ফিরবার পর নিজেকে প্রদীপ পেয়েছিল গাড়ীর ব্যাকসিটে। সুপ্তীও ছিল সাথে। হাত-পা বাঁধা, মুখে টেপ। প্রদীপ ছেড়ে দিয়েছিল বাঁচার আশা। ভগবানের দয়া হয়েছে মনে হয়। অরবিন্দ তার সাথে থাকা লোকগুলোকে নামিয়ে দিয়েছিল শিলিগুড়ির সিটি সেন্টার মলে। তারপর এসেছে সোজা ন্যাওড়াভ্যালিতে। রিসোর্টের একটা রুম দিয়েছে বিশ্রাম নেবার জন্য। গর্ভবতী সুপ্তীকে দেখে মায়া হয়েছে অরবিন্দের। সে মানুষ। পশু তো নয়! এই রিসোর্টে তাদের রেখে মাইকেলকে সব বুঝিয়ে দিয়ে তাড়াহুড়ো করে চলে গিয়েছে অরবিন্দ। যাবার সময় শুধু বলেছে, 'চোখ-কান খোলা রাখা দরকার। কাছের মানুষ বড় শত্রু। ভগবানের দয়ায় ঝামেলায় পড়বেন না আর। আমার কথা কাউরে বলবেননা এইটাই অনুরোধ।' অল্প কিছু রুপি দিয়েছে সাথে। দিয়েছে দুই প্যাকেট গোল্ড ফ্লেক সিগারেট। এখানে মাইকেল নামের এক ড্রাইভারের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাইকেল দার্জিলিং এর লোক। সাত সিটের একটা টয়োটা অ্যাভেঞ্জা চালায় সে। এর বাইরেও ব্যবসা আছে। টাকা থেকে রুপি আর ডলার ভাঙানোর ব্যবসা করে ভালো পয়সা কামায়। তবে বেশি আয় হয় অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করা লোকদের নেপালে পাঠিয়ে। এই রিসোর্টে ভীড় করা ধনী মানুষদের সাথে সাথে কয়েকজন অবৈধভাবে এই দেশে প্রবেশ করা লোকজনও জুটে যায়। অপরাধীদের জন্য দারুণ এক আশ্রয় এই জায়গা। মাইকেল এখান থেকেই লোকজনদের টাকার বিনিময়ে পাঠিয়ে দেয় নেপালে। বিপদে পড়া মানুষরা বাঁচার জন্য টাকা ঢালতে কার্পন্য করেনা। এই দূর্বলতার সুযোগটা নেয় মাইকেল।

প্রদীপকে নেপালে পাঠিয়ে ভালো টাকা পাবে লোকটা। অরবিন্দ তাকে এই কথাই বলেছে। অরবিন্দের কথামতন টয়োটা অ্যাভাঞ্জা নিয়ে রিসোর্টের বাইরের গেটে অপেক্ষা করছে মাইকেল। প্রদীপ আর সুপ্তি তৈরি হলেই রওনা দেবে। প্রথমে যাওয়া হবে দার্জিলিং। সেখানে মাইকেলের বাড়িতে অপেক্ষা করতে হবে কিছুটা সময়। এই ফাঁকে নেপালে যাবার ভুয়া কাজগপত্র তৈরি হবে।

অরবিন্দ চলে যাবার পর এই রিসোর্টের চারপাশটা একটু ঘুরে দেখেছে প্রদীপ। অল্প কিছু আদিবাসীর বাস এদিকটায়। শ্রী চরণ রাই বসাক তাদেরই একজন। লোকটার ছেলে এই রিসোর্টে বাবুর্চির কাজ করে। তার কাছ থেকে জানা গেল আদিবাসীদের কষ্টের জীবনের কথা। ধনী হিন্দুরা এদিকের জমি কিনছে নয়ত দখল করছে। মাত্র তিন লাখ টাকায় ৩২ একর জমি কিনে এই রিসোর্ট করেছে এক ব্যবসায়ী। আদিবাসীদের জমি ছিল এসব। তারা তাদের প্রাপ্য দাম পায়নি। প্রায় জোর করেই নেওয়া হয়েছে সবকিছু। আদিবাসীদের নিজেদের বলতে এখন আর কিছুই নেই। বেশির ভাগ লোকই শিলিগুড়ি গিয়ে কাজ করছে। চেহারায় খুব একটা পার্থক্য না থাকায় অনেকেই হিন্দু ধর্ম গ্রহন করছে। সাধারন হিন্দুদের জুলুম থেকে বাঁচা যায় এতে। শ্রী রাই চরণ বসাকও হিন্দু এখন। জুতসই একটা নাম বেছে নিলেও আদিবাসী ধ্যানধারনা, সংস্কৃতি ছাড়তে পারেনি। এখনও গান-বাজনা নিয়ে আছে। বয়স হলেও এসব ছাড়া যায়না।

তার ছেলের এসব পছন্দ না। একটাই মাত্র ছেলে। বিয়ে করে আলাদা থাকে। মাস শেষ হলে বাবা-মাকে অল্প কিছু চাল পাঠায়। এত অল্পতে রাই-চরণ আর তার বউয়ের হয়না। উপোসই যায় মাসের অনেকগুলো দিন। তবে যেদিন রিসোর্টে ধনী লোকদের উৎসব হয় সেদিন ভালো খানা পাওয়া যায়। এই যেমন আজ রাতভর উৎসব

চলবে। উৎসব শেষে অল্প কিছু মাংস পাবে রাই চরণ। ঢোল বাজানোর জন্য বকশিসও পাবে। যদিও বকশিসের অর্ধেকটা রেখে দেবে ছেলে। ছেলের কারনেই এই রিসোর্টে ঢোকার অনুমতি পায় তারা। শ্রী রাইচরণ বসাক প্রদীপকে বলে, 'বাপের কাচ থেকে কমিশন খায় বাবু। কিরাম ছেলে দেইখছেন। বাবু একটু বিদেশী মাল খেতে মন চায়। দিবান।' প্রদীপ রাইচরণ বসাকের জন্য মদের ব্যবস্থা করে। বিদেশী মাল চুকচুক করে খায় রাইচরণ। আর বলে, 'স্বাদ। আহা স্বাদ। আমার ছেলেরে বলবেন না যেন বাবু।'

রাইচরন জানায় প্রতি দুই মাসে একদিন উৎসব হয় এই রিসোর্টে। কোলকাতা থেকে ধনীরা আসে। মদ খেয়ে মাতাল হয়। মাতলামী করে। এক-দুইদিন থেকে টাকা-পয়সা খরচ করে আবার চলে যায়। এই সময়ে অল্প কিছু আয় হয়। সেই আয়ে মাস চলার চেষ্টা চলে। আগে জমি ছিলো তাদের। তাতে ধান চাষ হত। এখন শুধু থাকার জন্য কুড়েঘর আর দুটো শূকর আছে। জীবনে কষ্টের শেষ নেই। কষ্ট থাকলেও মরতে চায়না রাইচরন। সে বিদেশী মালের জন্য বেঁচে থাকতে চায়। বিদেশী মাল খাবার খুব শখ এই বুড়ো লোকটার।

অনেক কথা হয়। প্রদীপ জানতে পারে এই জঙ্গলে আজকাল আর হাতি টাতি আসেনা। আগে বাইসনের দেখা পাওয়া যেত। এখন সেসবও উধাও হয়েছে। মানুষ গাছ কাটছে। জঙ্গল আর জঙ্গল নেই। রাস্তা হচ্ছে। শহরের মানুষ এসে ঢুকছে এদিকটায়। বাড়ি ঘর বানানোর চেষ্টায় আছে। কথার পরে দেড়শ রুপি আর একটা বিয়ারের ক্যান দিয়ে রাইচরনকে বিদায় জানিয়ে নিজের রুমে ঢোকে প্রদীপ। সুপ্তি জেগেছে। এই রাতে দারুন লাগছে মেয়েটাকে। প্রদীপ তার পাশে বসে গালে একটা চুমু খায়। সুপ্তি তার কাছে সরে আসে। মেয়েটার শরীরে অদ্ভূত সুন্দর একটা ঘ্রান। মা হবার আগে এমন হয় কি?

'রওনা দিতে হবে। যত তাড়াতাড়ি পারা যায়।' সুপ্তিকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলে প্রদীপ। কথা বলতে বলতে চুমু খেতে থাকে সে সুপ্তির শরীরে।

'ইচ্ছা করেনা। এইখানেই সংসার পাতি চল।' বলে সুপ্তি। প্রদীপের আদরে কেমন চোখ বুজে আসে।

'তা হয়না। চলো চলো। দেরী করা যাবেনা।' আদরের লাগাম টেনে ধরে প্রদীপ। প্রদীপের তাড়া টের পায় সুপ্তি। মৃত্যুভয় নিয়ে বেঁচে থাকাই কঠিন। অসহ্য লাগে। কিন্তু কিছু করার নেই। লোকটাকে ভালোবাসে। অনিচ্ছা নিয়ে ব্যাগ গুছায় সুপ্তি। একটু সাঁজাও হয়। গালে পাউডার, ঠোটে লিপস্টিক, কপালে টিপ এতটুকুনই। তারপর রুম ছেড়ে বের হয়ে আসে দুজন। মাইকেলের সাথে কি সব কথা বলে কথা বলে প্রদীপ। মাইকেল গাড়ি ছাড়ে। পেছনের সিটে বসে প্রদীপ আর সুপ্তি। মাইকেল ঘড়ি দেখে বলে রাত নয়টা বাজে। প্রদীপের বিশ্বাস হয়না। মনে হয় মাঝরাত। জঙ্গলে বলে হয়ত। ন্যাওড়াভ্যালির রিসোর্ট পেছনে ফেলা হয় অল্প সময়ের ভেতরেই। চারদিকে আলো বলতে শুধু গাড়ির হেডলাইটের আলো। দূরের ছোট ছোট তারাদের সামান্য আলো আজ এতদূরে আসেনা। কেউ কোন কথা বলেনা। চুপচাপ তিনজন মানুষ। মাইকেলের এই নীরবতা ভালো লাগেনা। আড্ডা জমাতে চায় সে।

'পথ হারানোর ভয় আছে মিস্টার প্রদীপ। তবে ভয় পাবেন না আমি আছি।' সুন্দর বাংলায় কথা বলে দার্জিলিং এর মানুষ মাইকেল। অবাক হয় সুপ্তি। প্রদীপের সাথে আগেই কথা হয়েছে মাইকেলের। সে জানে এই বাংলায় কথা বলার পেছনের কারন। তাই সুপ্তির মতন অবাক হওয়া হয়না। দার্জিলিং এর বেশিরভাগ লোকই নাকি বাংলাটা ভালো জানে। ব্যবসায় কাজে দেয়। কোলকাতা থেকে দেদারসে লোকজন আসে ঘুরতে। তাদের সাথে বাংলায় কথা না বললে ঠিক জমেনা।

'ভয় নাই। ভয় পাইনা।' বলে প্রদীপ।

'মিস্টার আপনাকে দেখেই মনে হয় ভয় কম পান। হা হা।' শব্দ করে হাসে লোকটা। বাচ্চাদের মতন হাসি। শুনতে ভালই লাগে। লোকটা একনাগাড়ে নিজের কথা বলেই যায়। বলে টাইগার হিলের কাছে তার বাসার কথা। বাসা ঢেকে থাকে মেঘের চাদরে। জানালা দিয়ে ছুয়ে দেওয়া যায় মেঘ। দূর পাহাড়ের আড়াল হতে সূর্যটা ওঠে দেরি করে প্রতিদিন। একটা কুকুর আছে তাদের। গোল্ডেন টিপস্ এর ফ্লাওয়ার টি খেয়ে বাদামী রং এর টিবেটিয়ান

কুকুরটা নিয়ে প্রায়ই সকালে হাটতে বের হয় মাইকেল। স্ত্রী মারা গেছে অনেকদিন হল। ছেলে ব্যাংক এ চাকরি করে। থাকে চেন্নাই। চৌদ্দ বছরের মেয়েটাকেই নিয়েই তার জীবন। মেয়ে বড় হচ্ছে। তার বিয়ে দিতে হবে। সে চলে গেলে কিভাবে একা থাকা হবে তাই নিয়ে চিন্তিত মাইকেল। গল্প বলার সময় মুগ্ধ হয়ে শোনে সুপ্তি। একসময় শেষ হয়ে যায় গল্প। মানুষের জীবনের গল্প কতটুকুন লম্বাই বা হতে পারে!

মাইকেল এরপর গান শোনে। 'আওয়ারা হু/ইয়ে গারদিশ মে হু/আসমান কা তারা হু।' গল্পের মতন সুপ্তী গানও মুগ্ধ হয়ে শোনে। গুনগুন করে গায়। মাইকেল তাল মেলায়। এদের মনে এত আনন্দ কই হতে আসে? প্রদীপের মেজাজ খারাপ হয়। গত কয়েকদিনের ঘটনাগুলো নিয়ে সে চিন্তা করতে থাকে। চিন্তা লাগামহীন হতে দেরি হয়না। নিজের পরিবারের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে মা-বাবার কথা। তিন ভাইয়ের সংসার ছিল। বড় দুই ভাই চিকিৎসক। আছে কানাডায়। প্রদীপ বরাবরই খারাপ ছাত্র ছিল। লেখাপড়ায় মন বসেনি কখনও। খুব ভালো ক্রিকেট খেলতো। এমনি খেলার সময় একদিন মাথা গরম করে মেরে বসেছিল এক খেলোয়াড়কে। ব্যাট দিয়ে মারতে মারতে থেতলে দিয়েছিল মাথা। মাথা গরম করা প্রদীপের কঠিন রোগ। মেজাজ গরম হলে আর এই পৃথিবীতে থাকেনা সে। মাথার ভেতরটা শূন্য হয়ে যায়। এই রোগের কারনেই জীবনটা ওলটপালট হয়ে গেল। পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে আড্ডা দেওয়া আর মারামারি করেই দিন কাটানো শুরু করল সে। মারামারি করবার জন্য তাকে ভাড়া করে নিয়ে যেত বিভিন্ন দল। হরতালে বিএম কলেজের সামনে ককটেল ফাটিয়ে দারুণ নাম হয়েছিল তার। তার মতন সাহসী ছেলে পুরো বরিশালে আর একটিও ছিলনা। কাউনিয়ায় এক ছেলেকে মেজাজ খারাপ করে বায়ান্নটা কোপ দেবার পর ডাক পড়েছিল নওরোজ শাহের কাছে। ততদিনে প্রেমও হয়ে গিয়েছে সুপ্তির সাথে। পাশের বাড়ির মেয়ে সুপ্তি। বাবা-মা দুজনেই শিক্ষিত মেয়েটার। দোতলা বাড়ি। একটা মাত্র মেয়ে। প্রতিদিন ঘর থেকে বের হলেই চোখাচোখি হত প্রদীপের সাথে। প্রদীপ বিরক্ত করত সুপ্তীকে। স্কুলে যাওয়ার সময় পথে আটকাত। ভালোবাসার কথা বলত। মেয়েটা রাগত খুব। রাগ করতে করতেই একদিন কেমন করে জানি প্রেম হয়ে গেল। ত্রিশ গোডাউনের গাছের আড়ালে উদ্দাম প্রেম চলত তাদের। ঘন্টায় একশ বিশ টাকা ভাড়ায় পাওয়া যেত নৌকা। সে নৌকা ভেসে চলত কীর্তখোলার বুকে। ক্লাস ফাঁকি দিয়ে চলে আসত সুপ্তি। তারপর সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত সময় কাটত দুজনের। গভীর রাতে সুপ্তীর ঘর লাগোয়া বারান্দায় মই বেয়ে উঠে আসত প্রদীপ। এসব ব্যাপার গোপন থাকেনা। জানাজানি হয়ে গেল। সুপ্তীকে পাঠিয়ে দেওয়া তার খালার বাড়ি ভোলায়। সুপ্তি সহজ মেয়ে নয়। বাড়িতে জানিয়ে দিল প্রদীপের সাথে বিয়ে না হলে মারা যাবে সে। বাবা-মা এসব কথায় কান দিলনা। এক ডাক্তারের সাথে বিয়ের কথা চলতে লাগল। সুপ্তী রাগ করে খেয়ে বসল স্যাভলন। হাসপাতালে নিয়ে প্রান বাঁচল কোনরকমে। একদিন সুযোগ বুঝে ভোলায় আসল প্রদীপ। তারপর সুপ্তীকে নিয়ে লঞ্চে করে পালাল। সুপ্তীর খালু ছিল ভোলার প্রভাবশালী ম্যাজিস্ট্রেট। পালানোর আধ ঘন্টার ভেতর পুলিশ দিয়ে ধরে আনা হয় প্রদীপ আর সুপ্তীকে। বুঝে গিয়েছিলেন প্রদীপ আর সুপ্তীকে নিয়ে টানাহেচড়া করে লাভ নেই কোন। সুপ্তীর বাবাকে বুঝিয়ে অইদিনই সব আয়োজন করে প্রদীপের সাথে বিয়ে পড়ানো হয়।

সেইতো একসাথে থাকা শুরু। এরপর থেকে কেমন কেটে যাচ্ছে জীবন। বিয়ের তো কম দিন হয়নি। এতদিন ধরে সুপ্তীকে আগলে রেখেছে প্রদীপ। কিংবা প্রদীপকে আগলে রেখেছে সুপ্তী!

গাড়ি পাহাড়ে পৌছায়। পাহাড় বেয়ে ওঠে ওপরের দিকে। মেঘের শহরে।

ভাবনার সুতো কাটে প্রদীপের। শীত শীত লাগে। রাত পোহালেই পৌছানো হবে দার্জিলিং। অচেনা শহর। অনির্দিষ্ট গন্তব্য।

পথ চলতে চলতে ফোন আসে মাইকেলের। একটানা গাড়ি চালিয়ে মাইকেল ক্লান্ত। ঘুমে ঢুলু ঢুলু তার চোখ। কণ্ঠে গান আছে তবুও। ফোনটা প্রদীপের। গান থামিয়ে ফোন ধরে মাইকেল। দু-তিনটে কথা বলেই তার হাত থেকে পড়ে যায় ফোনটা। গাড়ি থামায়। ভয়ে কাঁপতে থাকে মাইকেল। প্রদীপকে জানায় মেরে ফেলা হয়েছে অরবিন্দকে। শিলিগুড়ির এক বাসস্ট্যান্ডে পাওয়া গেছে স্যুটকেবন্দী অরবিন্দের লাশ। সুপ্তী একটু কেঁদে ওঠে।

খবরটা শুনে হাত-পা অবশ হয়ে আসে প্রদীপের। রাত ভোর হয়। করুনাময় এর কাজকর্ম বোধগম্য হয়না। বড় ক্লান্ত লাগে প্রদীপের। ক্লান্ত লাগে!

৮.

২৯ জুলাই, ২০০৮ : আড়ালে দাড়ালে

এক একটি গাড়ির দাম এক কোটি দশ লাখ।
চারটি প্রাডো গাড়ি দাড়িয়ে নওরোজ শাহের বাড়ির সামনে। নওরোজ শাহ বারান্দায় দাড়িয়ে আছেন। কোলে নাতি। গাড়ি কেনা হবে দুটো। নাতি গাড়ি পছন্দ করবে। বারান্দায় দাড়িয়ে বলবে কোন গাড়িটা পছন্দ তার। নাতির পছন্দই শেষ কথা।
গাড়ি দরকার। ব্যবসা ভালো যাচ্ছে। গাড়ি হল বিনিয়োগ। দল বড় হচ্ছে। তাদের যাতায়াতের জন্য ভালো ব্যবস্থা প্রয়োজন। সামর্থ্য থাকলে প্রাডোই বা নয় কেন?
সুপ্তীর মা এসেছে সকাল বেলা। মেয়েকে নিয়ে চিন্তিত। প্রদীপের খবর জানতে চায়। প্রদীপের খবর নওরোজ শাহের কাছে নেই। তিনি এদিকটা সামলাতে এতই ব্যস্ত যে অন্য খবর নিতে পারছেন না। সুপ্তী ভালো আছে এই খবর দিয়ে তার মাকে বিদায় করা হয়েছে।
গাড়ির ঝামেলা শেষ করে নিজের ঘরে এলেন নওরোজ শাহ। কাজের লোক ঘরে খাবার দিয়ে গেছে। তার নাতি এই সময় দুটো রুটি আর পেঁপে ভাজি খায়। নাতিকে নিজ হাতেই খাওয়ান তিনি। রুটির ভেতর পেঁপে নিয়ে রোল করতে করতে কথা শুরু করলেন জাহাঙ্গীরের সাথে।
'কি অবস্থা জাহাঙ্গীর? ওয়ার্ড কমিশনাররা কি বলে?'
'কাল বসবে আপনার সাথে। মিটিং এর জায়গা ঠিক হইছে। মোটামুটি সব হাতেই আছে।' ঘরের এক কোনায় দাড়িয়ে কথা বলে জাহাঙ্গীর। তাকে একটু চিন্তিত মনে হয়।

‘কেন্দ্রের খবর?’ নাতিকে খাওয়ানো মুশকিল। ঘরের এদিক ওদিক ছুটে বেড়ায়। তার পেছনে ছুটতে হয় নওরোজ শাহকে। তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তবে এই ক্লান্তিতে আনন্দ আছে। ক্লান্তি নিয়েই কথা বলেন জাহাঙ্গীরের সাথে। কথা বলা প্রয়োজন। সব খবর জানতে হবে। এই শহরের মালিক তিনি। যে কোন কিছুর বিনিময়ে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত থাকতে চান।
‘কেন্দ্র এমপির বউরে চায়। মানুষের ইমোশান।’
‘জয়নালের কি অবস্থা।’
‘লিস্টে তিনিও আছেন। চেষ্টা করতেছে ওয়ার্ড কমিশনারগো হাতে আনার।’
‘ভালো। রিপা না সিপা মাইয়াডারে ঢাকা দিয়া নিয়া আসো। জয়নাল আপনা আপনি লিস্ট দিয়া আউট হইয়া যাবে। খেলা না জমলে খেলায় মজা নাই।’
‘জ্বি নিয়া আসবো।’
‘প্রদীপের খবর কি জাহাঙ্গীর?’
‘খবর নাই কিছুদিন।’ মাথা নিচু করে বলে জাহাঙ্গীর।
‘কিছুদিন মানে কয়দিন? খবর রাখা দরকার ছিল না? জাহিদ আর মোবাশ্বির পোলাটার খবরও নিশ্চয় নাই?’ মেজাজ খারাপ করে কথা বলে নওরোজ শাহ। নাতি পাশে আছে বলে গলা চড়ানো হয়না।
জাহাঙ্গীর কথার জবার দেয়না। নিচু মাথা আরও নিচু হয়।
‘খবর নাও। ঘন্টাখানেক সময় দিলাম। আমার খবর চাই। এখন বাইর হও।’ নওরোজ শাহ আস্তে করে বলে। জাহাঙ্গীর ঘর থেকে বের হয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচে। বের হয়েই সে একটা মাইক্রো নিয়ে বিবির পুকুরের পাড়ের দিকে যায়। এইখানে ভালো দইবড়ার দোকান আছে। দইবড়া জাহাঙ্গীরের প্রিয় খাবার। জাহাঙ্গীর দইবড়া খায় আর খেতে খেতে ফোন দেয় কয়েকজনকে। খাওয়া শেষে যাওয়া হয় শহরের সবচেয়ে জনপ্রিয় চিকিৎসক মাহবুব সাহেবের চেম্বারে। চেম্বার কাছেই। চেম্বারে দুটো লাশ পড়ে আছে। থেতলে দেওয়া হয়েছে মাথা। আগে থেকে না জানলে চেহারা দেখে চেনা মুশকিল লাশ দুটো কার। জাহাঙ্গীর লাশ দুটো দেখে। লাশ পঁচতে শুরু করেছে। নাকে রুমাল চাঁপা দিতে হয়।
‘লাশ দুইটা নিয়ে কি করবেন?’ ডাক্তার মাহবুব প্রশ্ন করে জাহাঙ্গীরকে। এই মুহূর্তে চেম্বারে ভীড় কম।
‘থাকুক আরো কিছুদিন।’ বলে জাহাঙ্গীর। গন্ধে বমি আসে। দইবড়া বের হয়ে আসতে চায় পেট থেকে।
‘লাশের অবস্থা তো ভালো না।’ চিন্তিত চিকিৎসক বলে এবার।
‘লাশের আবার ভালো মন্দ কি? লাশতো লাশই।’ হাসে জাহাঙ্গীর।
‘এইভাবে তো বেশিদিন রাখা যাবেনা।’
‘সেইটা তো আমি জানি। কিন্তু ঝামেলা আছে যে। নওরোজ শাহরে এখন বলার উপায় নাই লাশ দুইটা জাহিদ আর মোবাশ্বিরের। তিনি জানতে পারলে খবরই আছে।’ বলে জাহাঙ্গীর।
‘জানাতে তো হবে। কয়দিন লুকায় রাখবেন? তিনি যেমন লোক তাতে টের পাইতে সময় লাগবেনা।’ লাশ রেখে চেম্বারের বাইরে আসে মাহবুব আর জাহাঙ্গীর। ডাক্তার সাহেব একটা সিগারেট ধরায়। টেনশানে আছে বোঝা যায়।
‘বেশিদিন লুকান লাগবেনা। বুদ্ধি করছি একটা। চিন্তা নিয়েন না।’ বলে জাহাঙ্গীর। ডাক্তারের সিগারেট শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে। তারপর বের হয়ে আবার কয়েক জায়গায় ফোন দেয়। কিছুক্ষনের ভেতরেই পঁচিশটার মতন মটর সাইকেল চলে আসে। তারপর পুরো শহর জুড়ে শোডউন চলে। কলেজ রোড এর দিকে গিয়ে এমপি সাহেবের দলের এক ছেলেকে কোপানো হয়। পুরো শহরকে জানিয়ে দেওয়া নওরোজ শাহের শক্তির কথা। বিকেলের দিকে তারা চলে যায় গাবখান ব্রিজের দিকে। ব্রিজের নিচে দুটো ট্রলার দাড়ানো। শাহ আলমের ট্রলার এগুলো। জাহাঙ্গীর একটা ট্রলারে গিয়ে ওঠে। ট্রলার চলতে শুরু করে। তীর থেকে দূরে গিয়ে দাড়ায়। বাইকে বসা

মানুষগুলো অপেক্ষা করে ব্রিজের ওপর। ট্রলারে শুধু শাহ আলম আছে। মুড়ি আর গুড় পানি দিয়ে মাখিয়ে জাহাঙ্গীরকে খেতে দেয় শাহআলম। মুখে মুড়ি দিয়ে কথা শুরু করে জাহাঙ্গীর।
'গুড় বেশি দিয়া ফালাইছেন মুড়িতে।'
'আরে খান মিয়া। পুরুষ মাইনষের মিষ্টি বেশি খাওন দরকার।' ঢিলে হয়ে নিজের লুঙ্গিও গিটটা শক্ত করতে করতে বলে শাহআলম। গিট দিয়ে আরাম করে বসে মুড়ি খায়। বিপক্ষ দলের জাহাঙ্গীরকে দেখার পর তাকে একটুও বিচলিত মনে হয়না।
'তা খবর টবর কি?'
'খবর তো আপনারা দিবেন। প্রদীপে নাই। আপনেই তো সব এলাকার।'
'এলাকার সব হইয়া তো শান্তি নাই। প্রদীপের সব কাম নিজের সামলাইতে হয়। যন্ত্রনা। আপনের এমপি সাহেবের বউও কল দেয় মিটিং এর লাইগা। আমি ছোট খাট মানুষ। এমপি সাহেবের বউয়ের লগে বইসা মিটিং করন কি আমারে মানায় কন?'
'মানে কি?'
'মানে কিছুনা। আমি শুধু কইতে আইছি ফাল একটু কম পাইরেন ভাই। আপনে জলের ডাকাত। জলের মানুষ স্থলে আইসা ফালাফালি করলে তো বিপদ। নাকি কন?
জাহাঙ্গীরের কথার জবাব দেয়না শাহআলম। তাকে চিন্তিত মনে হয়।
'আজকালকার দুনিয়া কোন কিছু গোপন থাকেনা না রে ভাই। সব শালা বেইমান। সব শালায় পয়সা খায়। আপনার দলে পয়সা খাওয়া লোক বহুত। আপনী গুণী মানুষ। অভিজ্ঞতা ম্যালা। আপনে এমন ভুল করলে তো চলবে না। পানি খাওয়ান।' মুড়ি খাওয়া শেষ করে পানি চায় জাহাঙ্গীর। শাহআলম পিতলের একটা গ্লাসে পানি এনে দেয়।
'এমপির বউয়ের সাথে আলাপ দিছেন। জয়নাল সাহেবের সাথেও ভালো রিলেশান আপনার। এত দিকে দৌড়াইলে ঝামেলা আছে। একটু স্থির হন। বুঝছেন। ট্রলার টা একটু দূরে ন্যান। নদী দেখি। আইজকার ওয়েদারটা বিউটিফুল।'
ভীতু শাহআলম ট্রলারটা নিয়ে দূরে যায়। মাঝ নদীর দিকে। খুব ভয় লাগছে। শেষ কবে ভয় পেয়েছিল মনে নেই তার। ভয় পাওয়ার কারনও আছে। বোকাসোকা জাহাঙ্গীরের এই চেহারার সাথে পরিচিত নয় সে। একা এসেছে বলে আপসোস হচ্ছে এখন। ট্রলারে নিজের লোকজন নেওয়া দরকার ছিল। শাহ আলম ট্রলার চালায়। পানি খেয়ে গামছা দিয়ে মুখ মুছে শাহ আলমের পাশে এসে বসে জাহাঙ্গীর।
'ট্রলার আমিও খারাপ চালাইনা বুঝলেন।'
'জ্বি।' আস্তে করে উত্তর দেয় শাহআলম। লুঙ্গির গিটে ছোট্ট একটা ফল কাটার ছুরি আছে। উল্টাপাল্টা কিছু হলে এই জিনিষ দিয়ে লড়াই করা যাবেনা।
'জাহিদ আর মোবাশ্বির পোলাটারে মাইরা ঠিক করেন নাই।'
'ভুল হইয়া গ্যাছে ভাই।' কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলে শাহ আলম। সে বুঝতে পেরেছে তৈরি হয়ে এসেছে শাহ আলম। জাহিদ আর মোবাশ্বিরকে মারার ঘটনা জাহাঙ্গীরের জানার কথা না। এই কাজ খুব গোপনে করা হয়েছে।
'কাইন্দেন না। আপনে গুণী মানুষ। গুণী মানুষ কানলে ক্যামন জানি লাগে। কি সুন্দর মেঘ করছে দেখছেন। নওরোজ শাহের এই মেঘ খুব পছন্দ। ওনার লগে থাকতে থাকতে আমারও মেঘ দেহনের অভ্যাস হইছে।' কথাটা বলে জাহাঙ্গীর মেঘ দেখতে থাকে। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে অনেকগুলো পাখি। সারিবদ্ধভাবে। মনে হচ্ছে প্যারেড করা দল। নিয়মকানুন মেনে উড়ছে। নদীর এই পাড়ের দিকটা নির্জন। আশপাশে শসার ক্ষেত। খুব ভালো শসা হয় এদিকটায়। এদিকে কাজটা সারলেই ভালো হবে। মেঘ আর পাখি থেকে চোখ না সরিয়েই পকেট

থেকে রিভলবারটা বের করে জাহাঙ্গীর। নতুন জিনিষ। কয়েকদিন আগে ভারত থেকে আনা হয়েছে। ব্যবহার করা হয়নি। আজ ব্যবহার করে বোঝা যাবে জিনিষটা কেমন।
'গুণী মানুষরা মাঝে মাঝে বোকামী করে আর বোকা মানুষরা গুণীগো হারাইয়া জিইতা যায়। এক জীবনে অনেক করছেন। এখন বাদ দ্যান।' কথাটা বলতে বলতে শাহআলমের দিকে তাকায় জাহাঙ্গীর। তারপর গুলী করে। পরপর দুটো। শাহআলম ছিটকে পড়ে যায় ট্রলারের পাটাতনে। বেশিক্ষন বাঁচেনা। জলডাকাত শাহ আলমের জীবনের গল্প থেমে যায় চিরদিনের জন্য। গুলির শব্দে সারিবদ্ধভাবে চলা পাখিগুলো এলোমেলোভাবে উড়তে শুরু করে। শাহআলমের রক্ত ছড়িয়ে পড়ে ট্রলারে। জাহাঙ্গীরের স্যান্ডেলে রক্ত লাগে। জাহাঙ্গীর রক্ত না মুছেই ট্রলার চালানোতে মন দেয়। নওরোজ শাহকে গিয়ে খবরটা জানাতে হবে। জাহিদ আর মোবাশ্বিরকে মারার দুঃখ এখন ভুলতে পারবে নওরোজ শাহ। জাহিদ আর মোবাশ্বিরের লাশের বদলে শাহআলমের লাশ। মন্দ না। জাহাঙ্গীরের ভয় কমল। এখন আর নওরোজ শাহ তার ওপর রাগ করতে পারবেননা। শাহআলমকে মারার নিজের এই বুদ্ধিতে নিজেই মুগ্ধ হয় বোকাসোকা জাহাঙ্গীর।
ট্রলার চলে গাবখান ব্রিজের দিকে। সেখানে অপেক্ষা করছে বাইকে বসা লোকজন। ট্রলার চালানোটা উপভোগ করে জাহাঙ্গীর। ট্রলার সে ভালো চালায়। একটু বেশিই ভালো চালায়।

৯.

২৯ জুলাই, ২০০৬ : গতিতে গল্পের

এমপি সাহেবের বউ নির্বাচনে লড়বে।
জয়নাল সাহেবের হাত থেকে সবকিছু বের হয়ে যাচ্ছে। কোন কিছুই যেন আর নিয়ন্ত্রণে নেই। তবুও তিনি হাল ছাড়তে রাজি নন। এত সহজে হার মানলে তো চলবে না।
বাসার অবস্থা ভালো না। তহুরার সাথে আর কথা হয়নি। নিজ ঘরে আটকে থেকে তহুরা কাঁদছে সারাদিন। আরাফাত সেদিনই ঢাকা গিয়েছে। জয়নাল সাহেব যতদূর জানে আরাফাত দেশ ছাড়ার পরিকল্পনা করছে। মালয়শিয়ায় তাদের বাড়ি কেনা আছে। ছেলেটা সেখানে গিয়ে হয়ত থাকবে কয়েকদিন। এই ছেলের লজ্জা-শরম খুব বেশি। কেমন একদিনেই এলোমেলো সব।
জয়নাল সাহেব গ্যারেজ থেকে গাড়িটা বের করে। ড্রাইভারকে নিষেধ করে দেয় সাথে আসতে। সে নিজেই চালাবে গাড়ি। বের হবার সময় সাদিয়াকে চোখে পড়ে। মেয়েটা সিগারেট খাচ্ছে। জয়নাল সাহেব গাড়ি থামায়। সাদিয়া বাবার কাছে আছে। চালকের আসনে বসেই মেয়ের সিগারেট খাওয়া দেখে জয়নাল সাহেব। স্বরনালী, গলা, বুক দিয়ে ধোয়া নেমে ছড়িয়ে পড়ছে শরীরে। জয়নালের ভালো লাগেনা এসব দেখতে। মেয়েকে নাও করতে পারেন না তিনি। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া মেয়ে। এই মেয়ের ধরনধারনই আলাদা। বাবাকে দেখে নিজে থেকেই সিগারেট ফেলে দেয় সাদিয়া। জয়নাল সাহেব মেয়ের এই আচরনে খুশি হয়।
'তোমার সাথে যাব।' বলে সাদিয়া।
'কাজে যাচ্ছি তো।'
'ঘরে মন বসছে না। তুমি নেবে কিনা বল?' সাদিয়া বলে আবার। মেয়ের কন্ঠ শুনেই বোঝা যায় মন ভালো নেই। জয়নাল সাহেব না করবার সাহস পায়না। মেয়ে তার বড় পছন্দের।

‘আমি কি ড্রাইভ করতে পারি।’
‘না।’ কথাটা বলে গাড়িতে স্টার্ট দেন জয়নাল সাহেব। মেয়েকে পাশে বসিয়ে গাড়ি চালিয়ে সিএন্ডবি রোডের পথ ধরেন। আযম সাহেবের সাথে দেখা করতে যাচ্ছেন জয়নাল সাহেব। সামনাসামনি কথা না বললে আর হচ্ছেনা। সিএন্ডবি রোডে মেইন রোডের পাশেই আযম সাহেবের বড় পুকুর আছে। তার মাছ ধরার বাতিক আছে। তিনি এই পুকুর থেকে মাছ ধরেন। বছরের এই সময় মাছ ধরার প্রতিযোগীতা চলে। পুকুরগুলো ইজারা দেওয়া হয়। নয়শ, এক হাজার টাকা দিয়ে টিকেট নিয়ে মাছ ধরতে বসে যায় লোকজন। বড়শী নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থেকেও ক্লান্ত হয়না মাছশিকারীরা।
যাওয়ার পথে কোন কথা হয়না সাদিয়ার সাথে। পৌছে গাড়ি রাখতে সমস্যা হয়। পুকুরের চারপাশটা কাঁদা হয়ে আছে। পুকুর পাড় থেকে একটু দূরে গাড়ি পার্ক করে হেটে পাড়ের দিকে হেটে আসে জয়নাল সাহেব। সাদিয়া বসে থাকে গাড়িতেই। গান শোনে।
মনযোগ দিয়ে মাছ ধরছেন আযম সাহেব। এই পুকুরে মাছ অনেক। একটু পরপর ঘাঈ দেয় মাছগুলো। জয়নাল সাহেব গিয়ে চুপচাপ বসে আযম সাহেবের পাশে। তাকে বিরক্ত করে না। প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে আযম সাহেবই কথা শুরু করে।
‘পোস্টার দেখছ?’ ছোট্ট একটু কাঁশি দিয়ে বলেন আযম সাহেব। ঠান্ডা লেগেছে। কফ জমেছে গলায়। নওরোজ শাহ যেদিন নদীতে ফেললেন অইদিন থেকেই এ সমস্যা।
‘কিসের পোস্টার আযম ভাই?’ অবাক হয়ে বলে জয়নাল সাহেব। আযম সাহেবকে তিনি নাম ধরেই ডাকতে পারেন। ক্ষমতায় থাকলে ডাকতেনও। কিন্তু এখন অবস্থা ভালো না। ভাই ডাকাই নিরাপদ।
‘শহরে তো অনেক পোস্টার। সাজরিনী মার্কেটের নিচ দিয়া, নথুল্লাবাদ বাসস্ট্যান্ড পোস্টারে পোস্টারে ভর্তি। সবাই দেকছে। তুমি দেখলানা ক্যান?’
‘কিসের পোস্টার? কিছুই তো বুঝতেছিনা।’
‘কি মিয়া রাজনীতি করবা তুমি! রাজনীতি করলে চোখ-কান রাখতে হয় সবসময়। তোমার ভাই একটা ভুল কইরাই তো জীবন দিল।’
‘কিসের পোস্টার, কি নিয়া পোস্টার একটু খুইলা বলেন আযম ভাই?’ অপমান সহ্য করে বিচলিত জয়নাল সাহেব প্রশ্নটা করে।
‘আরাফাত আর তোমার বউয়ের ঘটনা নিয়া। ঘরের কথা বাইরের মানুষ ক্যামনে জানে কও তো?’ একটা মাছ ওঠে। ছোট্ট মাগুর মাছ। বড়শী থেকে মাছ ছাড়াতে ছাড়াতে কথা বলে আযম সাহেব।
‘আমি তো কিছুই বুঝতেছিনা।’ ঘটনায় হতবাক হয়ে মুখ কালো হয় জয়নাল সাহেবের। এত বিপদের ধাক্কা একসাথে সামলানো কঠিন।
‘না বুঝলে তো হবেনা। রাজনীতি করতে চাও, না বুঝলে হবে? আজকের মতন মাছ ধরা শ্যাষ। ফিস ফ্রাই আনতে দিছি। চল খাই। মেয়ে নাকি তোমার গাড়িতে?’
‘জ্বি।’ ছোট্ট করে বলে জয়নাল সাহেব। কথা বলতে ভালো লাগছেনা এই মুহূর্তে তার।
‘মেয়েকে ডাকো। তাজা ফিসের ফ্রাই খাক। শহরে তো এইসব জিনিষ টাকা দিলেও পাওয়া যায়না।’
আযম সাহেবের কথা শুনে জয়নাল সাহেব মেয়েকে ডাকতে লোক পাঠায়। মেয়ে আসেনা। জয়নাল সাহেব বিব্রত বোধ করে। আযম সাহেব না আবার অপমানিত বোধ করেন!
‘মায়ের এই ঘটনায় মেয়ের মনে হয় মন খারাপ, নাকি বলো?’
জয়নাল সাহেব কথার জবাব দেননা। এইসব কথার জবাব নেই। তার খেলা ফুরিয়ে এসেছে অনেকটা। তবে শেষ একটা চেষ্টা তিনি করবেন।

ফিস ফ্রাই চলে আসে অল্পক্ষনের ভেতরেই। খেতে ভালো। কিভাবে কিভাবে যেন রাধুনী মাছের শরীর থেকে কাটা আলাদা করে ফেলেছে। এত নরম যে মুখে দিতেই গলে গলে যাচ্ছে। সাদিয়ার জন্য প্লেটে করে ফিস ফ্রাই পাঠানো হয়। মেয়েটা চুপচাপ গাড়িতে বসে খায়।

'নওরোজ শাহের ব্যাপারে কি করবেন?' এক টুকরো মাছ মুখে পুরে বলে জয়নাল সাহেব।

'অধৈর্য হইওনা। তোমার অবস্থা দেইখে মনে হচ্ছে আশা হারাইছ। নেভার গিভ আপ মিয়া।'

'ধৈর্য্য ঠিকই আছে। কিন্তু সব কিছুর শেষ আছে। কিভাবে কি করা যায় বলেন?'

'বি এম স্কুলের মাঠের সামনের পুকুরটায় অস্ত্র ফালানো। রাতের বেলা কাউরে দিয়া ওঠানোর ব্যবস্থা করো। পানিতে ডুব মেরে জিনিষপত্র তুইলা আনবে।'

'প্লান করে রাখছেন?'

'আমি কাঁচা খেলোয়াড় না। যা করার দুই-একদিনের মধ্যে করতে হবে। রেডি থাইকো। ডাকলে যেন তোমারে পাই।"

'আমি চব্বিশ ঘন্টায়ই আছি আপনার পাশে। খালি ডাক দিবেন।' সাহসী হয়ে ওঠে জয়নাল সাহেব। তার কণ্ঠের জোর দেখেই বোঝা যায়।

'রাতে ফোন পাবা। আর পোস্টার নিয়া ভাবার দরকার নাই। চুপচাপ থাকো। সব চাঁপা পড়বে। এই দেশের মানুষ কোন কথা বেশিদিন মনে রাখেনা।'

'ভাবিনা। কিন্তু বোঝেনইতো।'

'বুঝি। সব বুঝি। এই শহরে নাটক অনেক বেশি হয়ে যাইতেছে। নাটক এবার বন্ধ হবে। সব ঠিক হবে। তুমি যাও আজকে। একটু বিশ্রাম নেবো। ঠান্ডায় নাক বন্ধ আমার।'

জয়নাল সাহেবের মুখে হাসি। মন ভালো তার। ভালো মন নিয়ে আযম সাহেবকে বিদায় জানিয়ে গাড়িতে ওঠেন তিনি। অবশেষে জিতেই যাচ্ছেন। জয়ের আনন্দই অন্যরকম।

সূর্যটা হেলে পড়েছে আকাশের এক কোনায়। রোদ-ছায়ার অগোছালো খেলা চলছে। ধূলো উড়ছে রাস্তায়। একটা রাতচরা পাখি চোখে পড়ে। কি অবাক কান্ড! এরা তো নিশাচর পাখি। এই আলোর ভেতর এদের কাজ কী! পাখি দেখে ভালো লাগে। সাদিয়া গাড়ি চালায়। জয়নাল সাহেব নিষেধ করেন না। মেয়ে গাড়ি চালাক। মেয়ের মন তাতে যদি একটু ভালো হয় তবে ক্ষতি কি তাতে?

'মা সোজা গাড়ি চালা। শিকাপুরের দিকে যাই। নইলে চল যাই দূর্গাসাগর। সুন্দর জায়গা। দেখলে মন ভালো হবে তোর।' হাসতে হাসতে বলে জয়নাল সাহেব।

সময় এসেছে শহরটা নিজের করবার। নওরোজ শাহকে সরিয়ে দেবার পরই আযম শাহকে নিয়ে ভাবতে হবে। এই লোক অতি ধূর্ত। কখন কি করে বসে বোঝার উপায় নেই।

পাশে এই সময় রিপা থাকলে মন্দ হতনা। রিপার শরীরের ঘ্রাণ পাগল করে দেয়। মেয়েটাকে দরকার। নিজের জীবনে এমন একটা মেয়ে থাকলে আর কি লাগে! সাদিয়া তো রিপাকে চেনে। রিপা বউ হয়ে ঘরে আসলে মেয়েটা আপত্তি না করলেই হল।

সূর্যের আলো তেরছা করে পড়ে গাড়ির কাচের জানালায়। সাদিয়া গাড়ি চালিয়েই যায়। কোন কথা নাই। গাড়ির গতি বাড়তে থাকে।

'রিপাকে চিনিস না। আমার অফিসে যে কাজ করে। ভালো মেয়ে। আরে মোবাইলটা গেলো কই?'

মোবাইল খুজতে থাকে জয়নাল সাহেব। সারদিনের টেনশানে কোথায় রাখা হয়েছে মোবাইলটা খেয়াল নেই। আযম সাহেবের ওখানে হয়ত পেলে আসা হয়েছে।

'রিপা আসছে।' গাড়ি চালানো অবস্থায় বলে সাদিয়া। মুখ-চোখ শক্ত হয়ে আছে তার।

মোবাইল খুজতে থাকা জয়নাল সাহেব থতমত খেয়ে যায়। মেয়ে অবাক হবার মতন কথাই বলেছে।

‘ভুলে গাড়িতে মোবাইল রেখে গেছ। ম্যাসেজ এসেছিল। চেক করেছি। সরি।’ নিজের কাছে থাকা মোবাইলটা দেয় বাবাকে সাদিয়া। তারপর গাড়ি চালানোতে মন দেয়। গাড়ি চলতে থাকে দূর্গাসাগরের পথ ধরে। সাদিয়া গতি বাড়ায়। জয়নাল সাহেব না করবার সাহস পায়না। গতি বাড়ে। আশি থেকে একশ আশির দিকে। বাড়তেই থাকে...।

১০.

৩০ জুলাই, ২০০৬ : শ্যাওলার ছায়ায়

এদিকে মদ সস্তা।
আকাশ হালকা কুয়াশায় ঢাকা। বাতাসে ঠান্ডা হাওয়া। ইলশেগুড়ি বৃষ্টি। ভিজে আছে পথ-ঘাট। রং-বেরং এর ছাতা নিয়ে লোকজন নেমেছে পথে। বেলা বাড়তেই কুয়াশা কাটে একটু একটু করে। কুয়াশার শরীর চীড়ে ঢুকতে থাকে সূর্যের আলো। ঝাপসা থেকে ধীরে ধীরে চোখের সামনে শহরটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
রেললাইনের ওপর একটা টিবেটিয়ান কুকুর এলোমেলো হেটে বেড়ায়। কতকগুলো বাড়ির ছাদে টাঙানো রঙিন পতাকা। টিভির অ্যান্টেনার কাছে ঘুরছে-উড়ছে গোটা চারেক পায়রা। ঘাসে, সবুজে, গাছের পাতায় লেপ্টে আছে শিশির। ছোট্ট স্কার্ট পড়ে স্কুলে যাচ্ছে গায়ে-গতরে বড় হয়ে ওঠা মেয়েরা। কেউ একজন বারান্দায় বসে চুল বাঁধছে। কাজের জন্য পাহাড়ের উচু পথ বেয়ে উঠছে লোকজন।
প্রদীপ চায়ে চুমুক দেয়। গোল্ডেন টিপস্ এর চা। নেশা ধরে যায়। এখানকার চায়ে কি মদ মেশানো হয় নাকি? নইলে এমন মাতাল করা স্বাদ কই থেকে আসে? মদও খাওয়া হয়েছে। হুইস্কি, জিন। বাছাবাছি নেই কোন। কাজু বাদাম চিবোতে চিবোতে মদ খেয়েছে প্রদীপ। টেনশানের সময় মদ কাজে দেয়। তবে এই মুহূর্তে মদের চেয়েও বেশি কাজে দিচ্ছে চা’টা। এত ভালো চা খাওয়া হয়নি আগে। মাইকেল ভালো চা বানিয়েছে। আশপাশের পাহাড় চা বাগানে ভর্তি। কিন্তু গোল্ডেন টিপস্ এর চা’ই সবচেয়ে ভালো বলে জানাল মাইকেল।
সকাল সকাল এসে ‘নিরুপমা’ হোটেলে উঠেছে প্রদীপ আর সুপ্তী। মাইকেল তাদের নামিয়ে দিয়ে গিয়েছে নিজের বাড়ি। ঘুম হয়েছে অল্প কিছুক্ষনের জন্য। ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই মাইকেলের সাথে দেখা হয়েছে আবার।

বাসায় নাকি মন টিকছে না তার। প্রদীপের সাথে আড্ডা দেবার জন্য এসেছে। অরবিন্দের মৃত্যুটা মেনে নিতে পারছেনা মাইকেল। ভয়ে, দুশ্চিন্তায় আর ঘুমই হয়নি তার।
'কেমুন একটা হাস্নাহুনার ঘ্রান না? এই এলাকায় এই ফুল ফুটে?' কথা বলতে বলতে জানালার কাছ থেকে সরে আসে সুপ্তি। হোটেলের জানালা দিয়ে এতক্ষন আকাশ দেখছিল সে। ময়ূরকণ্ঠী নীল আকাশ।
'নাই। এই ফুল নাই তো।' প্রশ্নটা প্রদীপকে করা হলেও জবাবটা দেয় মাইকেল।
'বাইর হওয়া যাবেনা?' মাইকেলকে এবার জিজ্ঞেস করে সুপ্তী।
'ব্রেকফাস্ট কি বাদ। টাউন ঘুমায়েঙ্গে।' ইংলিশ-হিন্দী মিলিয়ে হঠাৎ কথা বলে মাইকেল।
খাবার চলে আসে রুমে। পাউরুটি আর মাখন। সাথে আছে কমলা, তরমুজ আর এক কাপ গোল্ডেন টিপসের চা। ডিম সিদ্ধও আছে। মাইকেলও খায় তাদের সাথে। সবচেয়ে বেশিই খায়। সারারাত না ঘুমিয়ে, না খেয়ে, টেনশানে থেকে এখন গ্রোগ্রাসে গিলছে মাইকেল। খেয়ে কি মনে করে বিছানায় গা এলিয়ে দেয় সে। তারপর নাক ডাকতে শুরু করে। লোকটার এই অবস্থা দেখে কেন জানি মায়া হয় সুপ্তির। মাইকেলের ঘুম না ভাঙিয়েই তারা বের হয় শহর দেখতে।
রোদ উঠেছে। শীতল একটা হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগছে গায়। শহরটা ছোট। হেটে হেটেই চক্কর দেওয়া যায় পুরোটা। সুপ্তী বাজারে যায়। দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়ায়। অনেক কেনাকাটা করে। এখানকার বাজারে কাপড়ের দাম কম। মাত্র একশ রূপিতে একটা শাল পাওয়া যায়। জ্যাকেট, ব্র্যান্ডেড জুতোর দাম দেশের প্রায় অর্ধেক। সুপ্তী শাল, জ্যাকেট, জুতো সব কিনছে। দেশে ফিরে আত্মীয়দের দেওয়া হবে। সুপ্তীর পাগলামী দেখেও কিছু বলছেনা প্রদীপ। দেশে আদৌ ফিরতে পারবে কিনা তারই কোন নিশ্চয়তা নেই আর মেয়েটা সমানে কেনাকাটা করে যাচ্ছে।
সুপ্তীর হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। পেটের ভেতর বাচ্চা তাই অল্পতেই হাঁপিয়ে ওঠে সে। বাচ্চাটা আসার সময় হয়েছে। প্রদীপ সুপ্তীকে নিয়ে একটা খাবার দোকানে ঢোকে। একটু বিশ্রাম নিতে হবে। স্থানীয় খাবার মমোস খায় তারা। খেতে খেতে কথা বলে।
'ভালোবাসো আমারে?' কেন আচমকা এই প্রশ্ন করে ফেললো বোঝেনা প্রদীপ। পাহাড়ের দেশে এসে যেন বদলে গিয়েছে সে!
'বাসিতো। বাসি।' সুপ্তি হেসে ওঠে। স্বামী অনেক দিন পর এমন কথা বললো। লজ্জা লাগে সুপ্তীর। ভালোও লাগে।
'বাচ্চার খেয়াল রাইখো।' বলে প্রদীপ।
'বাচ্চা তোমার। খেয়াল তুমি রাখবা। এই দুষ্টের শিরোমনির খেয়াল আমি রাখতে পারবোনা।' খুশি হয়ে বলে সুপ্তী। দিনটা যেন প্রদীপের জন্য সুন্দর হয়ে ওঠে। কোন ঝামেলা নেই। দুজনে ঘুরে বেড়ানো আর কেনাকাটা করা। এমনই যদি যেতো দিনগুলো!
খাওয়া শেষ হয়। প্রদীপ আর সুপ্তী হাটতে হাটতে কাছের একটা মন্দিরে যায়। সুপ্তী প্রার্থনা করে। প্রদীপের জন্য, যে সন্তান আসবে তার জন্য, নিজের সুন্দর সংসারের মঙ্গলের জন্য। প্রার্থনা শেষে যাওয়া হয় সিনেমা দেখতে। নতুন হিন্দী ছবি এসেছে হলে। প্রচর ভীড়। টিকেট পাওয়া কঠিন। এখানকার মানুষ ছবি দেখে খুব।
সুপ্তীর ছবি ভালো লাগে। বরাবরই এই মেয়েটা হিন্দী ছবির ভক্ত। বিগ বাজারে ঢুকে বাচ্চার জন্য কাপড় কেনে সুপ্তী। যে সন্তান এখনো আসেনি তার জন্য পাগলামী দেখে অবাকই লাগে। কেনাকাটার ফাঁকে একটু আড়াল পেয়ে সুপ্তীকে চুমু খেয়ে বসে প্রদীপ। স্বামীর এই আচরনে আজকে অবাকপনা কাটতেই চায়না সুপ্তীর।
'কি হইছে তোমার? ঠিক আছো?' প্রদীপের জন্য চিন্তা হয় এবার।
'ঠিক আছি। শোন তোমারে হোটেলে দিয়া আসি। আমার কাজ আছে।'
'কি কাজ। পাহাড় দেখবো না।'

'হুম দেখবা। চলো নিয়া যাই। তারপর হোটেলে দিয়া আসবো।' কিছু একটা চিন্তা করতে করতে বলে প্রদীপ। তার মাথায় কি চলছে বুঝতে পারেনা সুপ্তী। স্বামীকে না বুঝতে পারলে বড় অসহায় লাগে সুপ্তীর। কান্না পায়। বাচ্চাটা পেটে আসার পর একটু বেশি বেশি করে কান্না পায় আজকাল।

সুরটা কেঁটে গিয়েছে। পার্কে গিয়ে আর ভালো লাগেনা। পাহাড় দেখা হয় দূরবীণ দিয়ে। তিব্বত, চীন, নেপালের সাদা বরফে ঢাকা পাহাড়গুলো দেখে মুগ্ধ হতে হয়। এত সুন্দর দেখা হয়না অনেকদিন। টুকটাক জিনিষপত্র কেনা হয় এখান থেকে। এসবের পরও কিছুই আর ভালো লাগেনা সুপ্তীর। সুন্দর একটা দিন এভাবে নষ্ট হয়ে যাবে ভাবেনি সুপ্তী। ফেরার পথে খাওয়া হয়। চিপস্, আমের জুস, আচার। সবকিছু বিস্বাদ লাগে। প্রদীপ আর সুপ্তী কেউ কোন কথা বলেনা। যাওয়ার পথে এক জায়গায় থামে প্রদীপ। সুপ্তিকে পথের ওপর রেখে একটা বাড়ির ভেতর গিয়ে কয়েকজন লোকের সাথে কথা বলে। নেপালে কিভাবে যাওয়া যায় সেটা জেনে লোকগুলোর কাছ থেকে। শিলিগুড়ি থেকে পনের ঘন্টার পথ। শিলিগুড়ি থেকে কাকড়ভিটা হয়ে যেতে হবে। পথে নেপালে ঢুকতে গাড়ির জন্য ট্যাক্স দিতে হবে পনেরশ রুপির মতন।

কাজ শেষ করে হোটেলে পৌছাতে সময় লাগেনা। গিয়ে দেখে মাইকেলের ঘুম ভেঙেছে। রুমের বারান্দায় বসে মদ খাচ্ছে লোকটা। সিগারেটও আছে সাথে। সুপ্তী কেনাকাটা করা কাপড়গুলো ব্যাগে গুছিয়ে রাখে। তারপর বিছানায় শুয়ে থাকে। মন ভালোনা তার। প্রদীপ বুঝতে পারে। কিন্তু কিছু করার নেই। প্রদীপ মাইকেলের সাথে বারান্দায় বসে কথা বলে। শুয়ে শুয়ে সব শোনে সুপ্তি। তার ঘুম আসেনা। চোখের পাতা কেমন খসখসে হয়ে আছে।

'অরবিন্দের ব্যাপারটা যাচ্ছেনা। কার কাজ?' গোটা দুই ঢেকুর তুলে কাজু বাদাম আর ছোলা মুখে পুরতে পুরতে বলে মাইকেল।

'ভাবতেছি। শত্রু আশপাশেই আছে। বিশ্বাস করতে পারিনা কাউরে।' আফসোস করে কথাটা বলে প্রদীপ। নওরোজ শাহকে নিয়ে হতাশ সে। ভেবেছিল লোকটা তার ক্ষতি হতে দেবেনা। কিন্তু ভুল। প্রদীপের জীবনই বিপন্ন এখন। কে করতে পারে কাজটা তা নিয়ে অনেক ভেবেছে প্রদীপ। নওরোজ শাহ এমন কখনও করবেন না। তিনি মরে যাবেন তবুও কথার বরখেলাপ হবেনা। প্রদীপের দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। নওরোজ শাহ থাকতে তার কোন ক্ষতি হবার কথা না। জাহাঙ্গীর ছাড়া আর কাউকে সন্দেহ করা যাচ্ছেনা। আর কারও এতদূর এসে প্রদীপের সাথে লাগতে আসার সাহস হবেনা। জাহাঙ্গীরও বা সাহস পাবে কি করে? বোকাসোকা একটা লোক। জাহাঙ্গীর এসব করলে নওরোজ শাহেরও তো টের পাবার কথা। কোনভাবেই অঙ্ক মেলাতে পারেনা প্রদীপ। কেমন কঠিন এক ধাঁধার ভেতর পড়ে গিয়েছে সে।

দার্জিলিং এ রাত খুব দ্রুত নামে। সন্ধ্যের শরীর ঢেকে টুপ করে রাত নামতেই বৃষ্টি শুরু। শীত বাড়ে। জ্যাকেটের ওপর আবার শাল গায়ে চড়ায় প্রদীপ। মাইকেলের সাথে আর কথাই হয়না। লোকটা নিজের মতন মদ খায় আর হিন্দী গান গায়। গানের কথা এলোমেলো হয় মাতাল হবার কারনে। 'পেয়ার হুয়া একরার হুয়া...' এই একটি গানই ভুলভালভাবে গেয়ে যায় লোকটা অনেকক্ষন ধরে।

রাত একটু বাড়তেই মাইকেল বাড়ির দিকে যায়। রাতে একটু বের হবে বলে মাইকেলের কাছ থেকে গাড়ির চাবি নিয়ে নেয় প্রদীপ। মাতাল মাইকেলও সরল মনে চাবি দিয়ে দেয়। কোন মদের দোকান খোলা থাকবে সারারাত জেনে নেয় প্রদীপ। মাইকেল ভাবুক মদ কিনতে যাবে বলে গাড়িটা রেখে দিয়েছে প্রদীপ। গাড়ির চাবির সাথে প্রদীপ আর সুপ্তি জন্য নতুন করে বানানো পাসপোর্ট, নেপালে যাবার কাগজপত্রও রেখে দেওয়া হয়।

রাতের খাবার খেয়ে নেয় প্রদীপ আর সুপ্তী। ডাল আর রুটি। না খাওয়ার মতন করে খাওয়া। সুপ্তীর সাথে কথা হয়না। দুজনেই বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে। বাইরে প্রচন্ড শীত। ঝড়ো হাওয়া বইছে। বরফশীতল বাতাসে শরীর কেঁপে ওঠে। রুমে হিটার থাকায় শীতের তীব্রতা এতটা টের পাওয়া যায়না। সুপ্তী জেগে থাকতে পারেনা। ঘুমিয়ে পড়ে। সুপ্তির ঠোটে, পেটে যেখানে বাচ্চাটা আছে সেখানে আলতো করে একটা চুমু খেয়ে বিছানা থেকে নামে

প্রদীপ। কাপড় পড়ে। বারান্দায় রাখা চেয়ারটায় বসে একটু মদ খায়। মদ খেতেই মাথা ধরে। কিন্তু শরীর গরম হয়। শরীর গরম হওয়াটা এখন জরুরী। যেতে হবে অনেকটা পথ। নিজের ব্যাগ থেকে টাকা, সুপ্তীর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আর নিজের অস্ত্রটা সুপ্তীর ব্যাগে রাখে প্রদীপ। এসব লাগবে। দেশে ঢুকতে লাগবে। অস্ত্রটা থাকলে নিরাপদে থাকবে সুপ্তী। সাহস বাড়বে মেয়েটার। ভালোয় ভালোয় দেশে ফিরতে পারলেই হল। প্রদীপের যাই'ই হোকনা কেন সুপ্তীর বেঁচে থাকা দরকার। বাচ্চাটার বেঁচে থাকা দরকার।
বেশি দেরি করেনা প্রদীপ। গাড়ির চাবি, কাগজপত্র নিয়ে চুপিচুপি রুম থেকে বের হয়। গাড়িতে ওঠে। অন্ধকার চারপাশ। ঘুমিয়ে সবাই। দু-একটা বাড়ির আলো জ্বলছে শুধু। ঝড়ো হাওয়ার ভেতর চলতে শুরু করে গাড়ি। প্রদীপের কান্না পায়। সুপ্তীর জন্য নাকি বাচ্চাটার জন্য বোঝা যায়না। সে খারাপ মানুষ। তার কাঁদা নিষেধ। খারাপ মানুষ বলে তার আফসোস হয়। সুপ্তীর কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে করে। মেয়েটাকে একা এভাবে রেখে যাওয়া কি ঠিক হল? প্রদীপ ফিরে যেতে চায়। কিন্তু ফেরার উপায় নেই। হেডলাইটের আলোয় গাড়ি চলে। চলুক। জীবন নিয়ে আর ভাবতে ইচ্ছে করেনা প্রদীপের। যা ইচ্ছে হোক। যেভাবে চলার চলুক। শুধু সুপ্তী ভালো থাক। বাচ্চাটা ভালো থাক। এইতো।

১১.

৩০ জুলাই, ২০০৬ : বক্ররেখা সরলরেখা

জবেহ করা হয়েছে।
ঢাকা থেকে সরকারী দলের গন্যমান্য কিছু লোক এসেছে। তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকাল সকাল দুটো গরু জবেহ করা হয়েছে। বাসমতী চাল, কই মাছ, রুই মাছ, ডিমের কোরমা, আটার রুটি, নারকেল দিয়ে মুরগীর ঝোল করা হয়েছে রান্না । বাড়িতে উৎসবের ছোয়া। সবাই ব্যস্ত।
নওরোজ শাহ নিজের লাইব্রেরীতে বসে আছেন। একা। ছোট্ট একটা ঘরে অল্প কিছু বই নিয়ে লাইব্রেরী করেছেন। তিনি প্রচুর বই পড়েন। আউট বই। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তার নেই। কিন্তু বই পড়তে ভালো লাগে। বই কেনাটা শখের মতন। ধর্মীয় বই, ধর্মীয় কাহিনীর প্রতি দারুণ আগ্রহ। ইতিহাসের ঘটনা পড়তেও ভালো লাগে।
আজ পড়ছেন তাজমহল নিয়ে। তাজমহলের পেছনের কাহিনী শুনে মন ভার হচ্ছে। তাজমহল যে মিস্ত্রীরা বানিয়েছেন তাদের সর্দার ছিলেন ইদ্রিস খাঁ। মহলের কাজ শুরু হবার সময়েই কথা ছিলো কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ কোন ছুটি পাবেনা। বাইশ বছর ধরে চলে নির্মাণের কাজ। একবার গ্রামে থাকা ইদ্রিস খাঁ এর মেয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। মৃত্যুর আগে মেয়েটা শেষ বারের মতন দেখতে চেয়েছিল বাবাকে। ইদ্রিস খাঁ সম্রাটের কাছে ছুটির আবেদন করে। সে আবেদনে সাড়া দেয়নি সম্রাট। লোকটার কাঁকুতি-মিনতি দেখে মন গলেনি কারও। মেয়েটা মারা যায়। তাজমহলের আড়ালে চাঁপা পড়ে যায় কন্যাহারা পিতার বেদনা।

কাজ শেষে সম্রাট ইদ্রিশ খাঁ এর পাঞ্জা কেটে নেন। তার বিদ্যা যাতে অন্য মানুষে না ছড়ায়, তাজমহল যাতে আরেকটা না হয় তার জন্যই এ ব্যবস্থা। মানুষ শুধু ভালোবাসার গল্পই শোনে। আলোর পেছনে অন্ধকারটুকুন নিয়ে কারো কোন মাথাব্যাথা নেই। পড়তে পড়তে চোখ ভিজে যায় নওরোজ শাহের। বই পড়তে গলেই মন নরম হয়ে আসে।

ছোবহান মেয়ার পোলের পাশে ছয়টি লাশ ভেসে উঠেছে আবার। তাদেরকে জবেহ করা হয়েছে। আজ সকালে যে মানুষগুলো গরু জবেহ করার কাজ করেছে তারাই মানুষগুলোকে খুন করেছে। জবেহ করার কাজে তারা পটু। যুদ্ধ শুরু হয়েছে। নওরোজ শাহ পিছিয়ে পড়তে চাননা। জয়নালের লোকজন গতকাল রাতে নওরোজ শাহের দলের চার জন লোককে গুলি করেছে। জয়নালের একার এমন কাজ করবার সাহস নেই। আযম সাহেব আছে পেছনে এটা সহজেই বোঝা যায়। নওরোজ শাহ চুপ করে নেই। তার দলের লোকজনকে গুলি করবার পরপরই জয়নালের লোকদেরকে জবেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

শহর গরম হয়ে উঠেছে। কিছু মানুষ গরম হয়ে উঠেছে। তাদের ঠান্ডা করা দরকার। এই শহরে শুধু নওরোজ শাহ'ই গরম হবেন। আর কেউনা।

খুব ব্যস্ত সময় যাচ্ছে। নওরোজ শাহের শরীর ভালোনা তবুও সব কাজে সময় দিতে হচ্ছে। নিজে থেকে উপস্থিত থেকে করতে হচ্ছে সব। কিছু কাজ নিজের করবার জন্য। এসব কাজ অন্যের হাতে ছেড়ে ভরসা পাওয়া যায়না। নওরোজ শাহের ছেলে এসেছে। পড়াশোনার মাঝখানে বিরতি। ডাক্তারদের পড়াশোনার শেষ নাই। দুই দিন পরপর পরীক্ষা। ছেলে এসেছে বাবাকে দেখতে। ক্যান্সার থাকলেই ভয়। দূর্ঘটনা ঘটতে পারে যে কোন সময়। তাই এসময়ে আত্মীয় স্বজনের পাশে থাকা উচিত। ছেলে তাই বাবার সাথে কয়েকদিন থাকবার জন্য এসেছে। ড্রইং রুমে খাবার দেওয়া হয়েছে অতিথিদের। ছেলেই সব দেখভাল করছে। ছেলে ইংরেজীতে ভাল। তাক লাগিয়ে দেবার মতন কথা বলে ইংরেজীতে। অতিথিদের সাথে ইংরেজী বাংলা মিলিয়ে কথা হচ্ছে।

লাইব্রেরী থেকে বের হয়ে নিজের ঘরের দিকে যেতেই ছেলের কথা, অতিথিদের কথা ভাঙা ভাঙা ভাবে কানে আসে। ছেলে বড় হয়েছে। রাজনীতি নিয়ে কথা বলছে। দু-একটা কথা কানে যেতেই অবাক হন নওরোজ শাহ। একই রক্তের তাই স্বাভাবিকভাবেই ছেলের এসব ব্যাপারে আগ্রহ থাকবে এমনটা ভেবে অবাকপনা চাঁপা দেন নওরোজ শাহ। একটু বিরক্তও হন। তিনি চাননা ছেলে এসব ব্যাপারে নাক গলাক।

মনটা নরম থাকতে থাকতে জাহাঙ্গীরকে ডাকেন নওরোজ শাহ। জাহাঙ্গীরকে খারাপ কিছু বলবার ইচ্ছে নেই এখন। ছেলেটাকে পছন্দ করেন। এতিম জাহাঙ্গীরকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে এসেছিলেন নওরোজ শাহ। সেই ছোটবেলা থেকে এখানেই বড় হয়েছে জাহাঙ্গীর। মগজ কয়েক ছটাক কম আছে তার। তাই হয়ত আর সবার চেয়ে সে বেশি প্রিয় নওরোজ শাহের কাছে। জাহাঙ্গীরের কোন দাবি-দাওয়া নেই। কখনও কোন কিছুর জন্য বায়না ধরেনা সে। এমন ছেলে আজকাল খুজে পাওয়া মুশকিল।

'ডাকছিলেন।' রুমের ভেতর ঠিকমতন না ঢুকে দরজার আড়ালে দাড়িয়ে কথা বলে জাহাঙ্গীর।

'জীবনে এই প্রথম তুমি মনে হয় এমন কাজ করলা, নাকি?' বলে নওরোজ শাহ। ইদানীং শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। কথা বলে আগের মতন আরাম পাওয়া যায়না।

'বুঝি নাই। ভুল হইছে।' দূরে দাড়িয়েই বলে জাহাঙ্গীর।

কঠিন অপরাধ করেছে জাহাঙ্গীর। এত বড় কিছু করে লুকাবে জাহাঙ্গীর ভাবেনি নওরোজ শাহ। তার ভাবনার বাইরে হচ্ছে আজকাল সবকিছু। বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন। পিছিয়ে পড়ছেন।

'বাইরের অতিথিদের সাথে সন্ধ্যার পরে বসবো। তুমি আজকে রাতে ছেলেপুলা সব ডাকো। বলবা জরুরী মিটিং। সবাই যেন থাকে।'

'জ্বি। যাবো এখন?'

‘যাও। শোন, তোমার অপরাধের মাফ হয় নাই। এই ব্যাপার নিয়া পরে কথা হবে। আমার নিজের কাছের মানুষ অপরাধ করবে এইটা আমি সহ্য করবো না। যাও এখন। অতিথিদের যেন অযত্ন না হয়। আর ছেলেটারে পাঠাও।’ কথাটা বলে নওরোজ শাহ পাশে থাকা হাত পাখাটা নেন। লোডশেডিং। জেনারেটরেও কি যেন সমস্যা। ঘরে কেউ নাই। হাত পাখাটা নিজেকে তুলে নিতে হয় তাই। শাহ্ আলমের ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা হয়। তার লোকজন প্রতিশোধ নেবেই।

ছেলে ঘরে আসে। বাবার কাছ থেকে নিয়ে নেয় হাত পাখাটা। বাতাস করে। কোন কথা বলেনা। বাবা আর ছেলে চুপচাপ একদম। ঘরের জানালা দিয়ে গরম হাওয়া এসে ঢোকে। জানালার পর্দায় ঠাই নেওয়া রোদ আর ছায়া উঁকি দেয়..।

‘ভালো আছো?’ কাঁশি দিয়ে কথা বলে নওরোজ শাহ। গলা খুসখুস করে।

‘জ্বি। শরীর ভালো?’

‘না। ক্যান্সার রোগীর শরীর ভালো থাকেনা। তুমি তো ডাক্তার। তোমার তো বোঝার কথা।’

‘আমি ডাক্তার হই নাই। পড়তেছি।’

‘ভালো। শুন, তোমার বিয়ে দেব আমি। পছন্দের মেয়ে থাকলে তোমার মা’রে বল।’

‘পড়াশোনা শেষ হয় নাই আমার।’

‘তোমার বয়সে আমার প্রথম সন্তানের মুখ দেখছি। না শুনতে ভালো লাগেনা। মরার আগে বড় একটা উৎসব দেখতে চাই আমি।’

‘জ্বি। একটু সাবধান থাকবেন।’

‘কেন এই কথা বললা। আমি কেমন থাকব এই নিয়া তোমার ভাবতে হবেনা। অত যোগ্যতা তোমার এখনও হয় নাই।’

‘ভুল বুঝতেছেন। ঢাকা থেকে আসা লোকগুলার সাথে কথা বলার পর সুবিধার মনে হয় নাই কিছু। পরিস্থিতি ভালো না। তাই বলছি।’

‘ডাক্তার মানুষ পরিস্থিতি দিয়া কি করবা ? মানুষের হাড়-হাড্ডি নিয়া গবেষনায় মন দেও। শহরের পরিস্থিতি নিয়া তোমার ভাবার মতন কিছু হয় নাই।’

‘আমি আপনাকে নিয়া ভাবি। পরিস্থিতি নিয়ে না।’

‘এই শহর আমার। দুই লাইন পইড়া এই শহর নিয়া তুমি আমার চাইতে বেশি বুঝতে আইসোনা।’ রেগে যান নওরোজ শাহ। কারেন্ট আসে। হাত পাখা রাখা হয়। মাথার ওপর ফ্যানটা ঘুরতে থাকে। ফ্যানের বাতাসে নওরোজ শাহ ঠান্ডা হননা। ছেলের কথা শুনে রাগ বাড়তে থাকে। মাথা গরম হয়।

‘রাগ হবেন না। শরীর ভালো না আপনার। রেগে গেলে ক্লান্ত হবেন। আপনার কথাই থাকবে। বিয়ের আয়োজন করেন।’

‘তোমারে আর দশটা বাপের মতন দেইখা রাখতে পারিনি। আমি দেখলে তুমি এমন লায়েক হইতা না। কম বুঝতা।’ গলার স্বর ওপরে উঠতে থাকে এবার।

‘সব বুঝা আপনি একা বুঝলে ঝামেলা। আমি যাবো?। অইদিকে ঝামেলা। গেস্টরা আছে। খেয়াল রাখতে হবে।’ ছেলে যাবে কি যাবে না রেগে থাকা নওরোজ শাহ্ এই নিয়ে কিছু বলেন না। রাগ নিয়ে চুপ করে বসে থাকেন। ঠান্ডা ফ্যানের বাতাসে গরম হন। মরার আগে ছেলের বিয়েটা তিনি খেয়ে যেতে চান। তাছাড়া বড় একটা আয়োজন, উৎসবের পর অনেক ভোট তার বাক্সে চলে আসবে। এই ব্যাপার ছেলেকে বোঝানো যায়না। অপদার্থ ছেলে। এই ছেলে নিয়ে নওরোজ শাহের মন খারাপ হয়।

ছেলে রুম থেকে বের হয়ে যায়। বাতাসে খাবারের ঘ্রান। ডালটা স্বাদের হবে আজকে। এই বাবুর্চী ডাল ভালো রাঁধে। নওরোজ শাহের পেটপুরে খেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু উপায় নেই। ডাক্তারের নিষেধ আছে। যা ইচ্ছা তাই

খেতে পারেননা নওরোজ শাহ। মৃত্যুর আগে মানুষের অনেক কিছু খেতে ইচ্ছা করে। তারও একই অবস্থা। নওরোজ শাহ ঘরের লাগোয়া বারান্দায় গিয়ে দাড়ান। দূরে আকাশে জমা হয়ে আছে মেঘ আর রোদ। বাড়ির সামনের মাঠের ঘাসে রোদ ঘুমায়। অনেক লোক আসা-যাওয়া করে। এই বাড়িতে ভীড় লেগে থাকে। মানুষের এই কোলাহল, কাজের তাড়া নিয়ে থাকা সবসময়ের ছোটাছুটি ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছে করেনা। নওরোজ শাহের মনে ভয় ঢুকেছে। তবে ছেলের কথা শুনে তিনি সাবধান থাকতে চাননা। এই শহরে এতদিন তিনি থেকে এসেছেন। তার ছেলে এসে এখন কিভাবে থাকতে হবে এটা শেখাবে সেটা মেনে নেওয়া যায়না। হাতছাড়া হয়ে যেতে চাচ্ছে সবকিছু। এসবে তার ভয় নেই। তিনি চাইলেই সবকিছু নিজের মতন করে করতে পারেন। শুধু একটা জিনিষ তার হাতে নেই। নিজের জীবন। ক্যান্সার শেষ করে দিচ্ছে তার ভেতরের সব। জীবনের ওপর হাত নেই। এই নিয়ে তাই নওরোজ শাহের অনেক আফসোস। সাহস হারানো মানুষ তিনি নন। হতেও চাননা।
বাড়ির সামনে মানুষের ভীড় বাড়ে। সেই সাথে বাড়ে কথার আওয়াজ। ভীড়ের ভেতর থেকে কয়েকটা ককটেল ছোড়া হয় নওরোজ শাহের দিকে। প্রচন্ড আওয়াজে ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে পড়ে যায় নওরোজ শাহ।
চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে আসে। নওরোজ শাহ বুঝতে পারেন তিনি মারা যাচ্ছেন। বুঝতে পারেন আজ তার শেষ দিন।

১২.

৩০ জুলাই, ২০০৬ : এখানে অন্ধকার

সাদিয়াকে পাওয়া যাচ্ছেনা।
সকাল থেকে খোঁজা হচ্ছে তন্ন তন্ন করে। প্রতিটা ঘরে, প্রতিটা জায়গায়।
জয়নাল সাহেব মেয়ের জন্য পাগল। কলিজার টুকরো মেয়ে তার। তিনি মেয়েকে খুঁজতে বেরিয়েছেন। কলেজ এভেন্যু হয়ে সদর রোড পর্যন্ত ছুটছেন তিনি। তার শরীর ঘামছে। শহরে শত্রুর অভাব নেই। যে কোন অঘটন ঘটতে পারে।
রিপাকে রাখা হয়েছে হোটেলে। অভিরুচি হলের পাশে নতুন একটা হোটেল করা হয়েছে। মালিক আযম সাহেব। এই হোটেলেই রাখা হয়েছে রিপাকে। বাসায় আসতে চেয়েছিল মেয়েটা। জয়নাল সাহেব রাজি হননি। বাসার অবস্থা ভালোনা। শহরের অবস্থা ভালো না। তহুরা নেই। আরাফাতও শহর ছেড়েছে। জয়নাল সাহেবের ভাবি নির্বাচনের জন্য তদবির করা শুরু করেছে। নওরোজ শাহের সাথে লড়াই করবার জন্য আযম সাহেবের সাথে কাজ শুরু করে দিয়েছে জয়নাল সাহেব। এমন অবস্থায় কোন যন্ত্রনা নেওয়া উচিত হবেনা। কোন নতুন কিছু মাথায় ঢোকানো যাবেনা।
সাদিয়া সকালে ঘর থেকে বের হয়েছে। রিপার ব্যাপারটা জানার পর থেকে তার মন খারাপ। রাত থেকে খাওয়া বন্ধ। জয়নাল সাহেবের সাথে কথা হয়নি মেয়ের। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেছে সাদিয়া। বাসা থেকে বের হবার

আগে মেয়ে বাবাকে আস্তে করে বলেছে, সে সাজরীনি মার্কেটে যাচ্ছে। জয়নাল সাহেব না করেননি। মার্কেটে কেনাকাটা করলে মেয়েদের মন ভালো থাকে। মেয়ের মন ভালো করার জন্য সব করা যায়। তাছাড়া নওরোজ শাহের ব্যাপারটা নিয়ে তার দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। দুশ্চিন্তার কারনে মেয়ে কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে কিছুই জিজ্ঞেস করা হয়নি সে সময়।

লোকজন জোগাড় করা হয়েছে। অস্ত্র প্রস্তুত। রাতের অন্ধকারে টাকা বিলানো হয়েছে পুরো শহরে। পুলিশরা টাকা খেয়ে বসে আছে। ওপর থেকেও পাওয়া গিয়েছে গ্রীণ সিগন্যাল। এখন শুধু অপেক্ষা সঠিক সময়ে আঘাত হানার। জয়নাল সাহেব গাড়ি নিয়ে চলে যান অভিরুচী হলের দিকে। রিপার কাছে যেতে হবে। শান্তি দরকার। টেনশান দূর করতে রিপার জুড়ি নেই।

রিপা ঘুমিয়ে ছিল। জয়নাল সাহেব এসে ঘুম ভাঙায়। কলাপাতা রং এর একটা সালোয়ার পড়ে আছে সে। চেহারায় মা মা ভাব। মা হবার আগে মেয়েদের চেহারায় এক ধরনের স্নিগ্ধতা আছে। জয়নাল মুগ্ধ হন রিপাতে। বিছানার কাছেন এসে রিপার কোলে মাথা রাখেন। রিপা জয়নালের চুলে বিলি কেটে দেয়।

একটু পরেই রিপা হোটেলের ওয়েটারকে ডাকে। ভদকা আনা হয়। চাওমিন, ছোলা, নুডুলস্ আসে ঘরে। জয়নাল সাহেবের মদ পোষায় না। রিপার বদ অভ্যাস আছে। মাঝে মাঝে সে মদ খায়। জয়নাল সাহেব পাশে থাকলে খাওয়া হয় বেশি। রিপা মদ খেতে থাকে আর জয়নাল সাহেব চাওমিন খায়। খুব বেশিক্ষন খাওয়া হয়না। খাবারগুলো নষ্ট হয়। প্লেটগুলো চুপচাপ পড়ে থাকে বিছানার পাশে। অনেকক্ষন চুপচাপ থাকবার পর কথা শুরু করে রিপা। তার গলা ভাঙা। ঠান্ডা লেগেছে। কফ জমেছে একটু। কাশি লেগেই আছে। কাশি দিয়েই কথা শুরু করে রিপা।

'বাসায় যেতে পারবোনা?'

'নিয়ে যাবো। ওয়েট করতে হবে। আমি ঝামেলায় আছি।'

'তোমার ওয়াইফ এর কথা শুনলাম। এবার অন্তত আমাকে বাড়িতে নিয়ে তুলতে পারো।'

'সবকিছু হুটহাট হয়না রিপা। সময় লাগবে। তোমাকে ঘরে তুলব। মাথায় আছে আমার।'

'না নাই। থাকলে নিজের সন্তানের খোজ নিতা। নাও নাই। ম্যাসেজের জবাব দাও নাই।'

'ঝামেলা ছিলো। আমি ঝামেলায় আছি।' এবার মেজাজ গরম হতে থাকে জয়নাল সাহেবের। ভেবেছিল রিপা শান্তি দেবে কিন্তু উল্টো নিজেকে নিয়ে পড়ে আছে মেয়েটা। রিপার পেটের সন্তান নিয়ে তার ভাবার এখন সময় নাই। তিনি আরো বড় কিছু নিয়ে ব্যস্ত।

'তোমার সবচেয়ে বড় ঝামেলা আমি। আমাকে নিয়ে ভাবো।'

'পাগলামী কথা না বলে কি থামা যায়? সাদিয়াকে পাচ্ছিনা সকাল থেকে। নওরোজ শাহের যন্ত্রনা থেকে মুক্তি নাই। এর মাঝে তোমার কাছে শান্তির জন্য আসলাম আর তুমি দিতেছ যন্ত্রনা। তুমি শিক্ষিত মেয়ে। তোমার আচরন এমন হয়ে গেলো ক্যান?' বিছানায় উঠে উত্তেজিত হয়ে কথা বলে জয়নাল সাহেব। তার হাতের ধাক্কায় পাশে থাকা প্লেটের চাওমিন পড়ে যায়।

'না থামা যায় না। আগে তোমার এমপ্লয়ী ছিলাম। এখন আর না। আমি রিজাইন লেটার তোমার টেবিলে রেখে আসছি। আমার এখন অন্য অধিকার।'

'সিনেমার ডায়লগ ভালো লাগেনা। আমি যাবো। সাদিয়াকে খোজা দরকার।' জয়নাল সাহেব বিছানা থেকে উঠে দাড়ান। তাকে রিপা হাত ধরে বসায় আবার। জয়নাল সাহেবের মুখটা বুকে চেঁপে ধরে। রিপার চোখ হতে জল গড়িয়ে পড়ে। জয়নাল সাহেবের গাল ভিজে যায় রিপার চোখের জলে। তিনি অবাক হন। রিপাকে এমন দেখা হয়নি আগে কখনও। রিপাকে কাছে টেনে নেন জয়নাল সাহেব। ভেজা চোখে চুমু খান। রিপার সাথেই তিনি থাকতে চান। থাকতে চান সারাটাজীবন।

ফোন আসে। সাদিয়ার ফোন। জয়নাল সাহেব রিপাকে সরিয়ে পাশে থাকা ফোনটা ধরেন। কথা হয় সাদিয়ার সাথে। সাদিয়া শুধু জানায় সে ঢাকা। সকালের ফ্লাইটে শহর ছেড়েছে সে। যে ফ্যামিলিতে তার মা নেই সেখানে সে থাকবেনা।

সাদিয়া ফোন কাটে। জয়নাল সাহেব হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো বলে যান অনেকক্ষন। ওপাশ থেকে কোন কথা শোনা যায়না আর। জয়নাল সাহেবের মন খারাপ হয়ে যায়। কেউ নেই তার। ভুল বুঝল মেয়েটাও। তিনি ইমোশনাল হয়ে ওঠেন। ভদকার বোতলে চুমুক দেন। জয়নাল সাহেবকে মদ খেতে দেখে রিপা না করেনা। মাতাল হোক লোকটা। এমন খারাপ লোকের মাতাল হওয়াই উচিত।

রিপা মদ ঢেলে দেয়। জয়নাল গ্লাসে কিছু মেশান না। একদম 'র' খান। মদের সাথে সেভেন আপ, কোকাকোলা কোন কিছুই মুখে রোচেনা। মদ গলা দিয়ে নামতে নামতে গলা জ্বলে, বুক জ্বলে। গরুর ভাজা মাংস খেতে খেতে রাগে, কষ্টে গলা দিয়ে মদ নামাতে থাকে জয়নাল সাহেব। রিপার মায়া হয়। রিপা চুপ করে থাকে। এমন লোকের শাস্তি পাওয়া উচিত। শাস্তি দেওয়ার সুযোগ পেয়ে ছাড়তে চায়না রিপা। অনেক ক্ষোভ জমে আছে। অনেক হিসেব নিকেশ নিয়ে বসতে হবে। নিজের লোকসান হোক চায়না রিপা। যে কাজ করতে এই শহরে আসা তার সেটা ঠিকমতন করতে হবে।

মদ খেয়ে জয়নাল সাহেব চিৎকার করতে থাকেন। ঘরময় লাফালাফি করেন। এটা ওটা ভাঙেন। ওয়েটার ছুটে আসে। লোকজন ভীড় করে দরজার বাইরে। রিপা সব সামাল দেয়। এই শহরে জয়নাল সাহেবের মুখ পরিচিত সবার। কেউ তাই তাকে ঘাটানোর সাহস পায়না। সন্দেহ নেই জয়নাল সাহেবের মদ খেয়ে মাতাল হবার কথা কিছুক্ষনের মধ্যেই চাউর হয়ে যাবে পুরো শহরে। তার কপাল পুড়েছে এবার ভয়ংকরভাবে। জয়নাল সাহেবের অবস্থা দেখে লোকজন আফসোস করে। কেউ মজা পায়। দু-একটা বাজে কথা বলে। তহুরাকে নিয়ে কথা হয়। জয়নাল সাহেবের উগ্র মেয়েকে নিয়ে কথা হয়। এসব নিয়ে কথা বলে মানুষ শান্তি পায়।

রিপা আর দুইজন ওয়েটার মাতাল জয়নাল সাহেবকে ধরে ধরে সিড়ি দিয়ে নামায়। জয়নাল সাহেবের চিৎকার থামেনা। সে বাচ্চাদের মতন শূন্যে হাত-পা ছোড়ে। কাঁদে। সাদিয়ার জন্য কাঁদে। তহুরাকে গালি দেয়। ভাই, ভাইয়ের বউকে গালি দেয়।

মাতাল হলে মানুষের শরীরের শক্তি মনে হয় বেড়ে যায়। জয়নাল সাহেবের সাথে পারা যায়না। বাগে আনা কঠিন হয়। অনেক কষ্টে তাকে গাড়িতে তোলা যায়। জয়নাল নিজেই গাড়ি চালায়। কাউকে গাড়ি চালাতে দেয়না। গাড়ির দরজা লক করে গাড়ি প্রচন্ড গতিতে ছোটায় জয়নাল সাহেব। আজ একটা গল্প শেষ হতে পারে। রিপা গল্পটা শেষ হোক সেটা চায়। প্রতিশোধের আগুন জ্বলে রিপার ভেতরে।

এরপরের ঘটনা রিপার জানা নেই। জয়নাল সাহেব গাড়ি নিয়ে কই গেল তা নিয়ে কোন মাথাব্যাথা নেই। কোন দূর্ঘটনা ঘটল কিনা এসব নিয়ে ভাবনা নেই একদম। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলে রিপা হোটেল থেকে নামে। কেউ একজন আসে তার কাছে। তার হাতে তুলে দেয় প্রায় ত্রিশ লাখ টাকা। সাথে ঢাকা যাওয়ার টিকেট।

শহরে ঝামেলা শুরু হয় রাতের দিকে। রিপা জানতে পারে কে বা কারা শহরের সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষটির বাড়িতে বোমা মেরেছে। সকালের ফ্লাইটে রিপা চলে যাবে। সে হোটেলের রুমের দরজা বন্ধ করে চুপচাপ ভদকার বোতল শেষ করতে বসে আর কথা বলে পেটের ভেতর থাকা জয়নাল সাহেবের বাচ্চাটার সাথে। তার বাবুটার সাথে।

'বাবু, কেমন আছিস?', 'মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গেলি নাকি?', 'গুলটু বাবুটা, সোনা পাখিটা আমাকে ক্ষমা করে দিস। তোর বাবাটা ভালো মানুষ না বুঝলি? তাইতো এইসব করা আরকি!', 'অই অই অই, সোনা বাবুটা, কুচু বাবুটা আমার...।' কত এলোমেলো কথা। অবাক হওয়ার কিছু নেই। মায়েরা বলে এসব। সব মায়েরাই বলে।

১৩.

৩১ জুলাই, ২০০৬ : আলপিনে কুয়াশা

দার্জিলিং এ আইর মাছ পাওয়া যায়?
সুপ্তী খাচ্ছে। সারাদিন খাওয়া হয়নি। কেঁদেছে মেয়েটা। প্রদীপের কথা ভেবে কেঁদেছে। কয়েকবার মরে যাবার চিন্তা করেছিল। চিন্তার লাগাম টেনে ধরেছে। প্রদীপ একা রেখে চলে গেল এই অচেনা জায়গায়। স্বার্থপরতা বাজে। সুপ্তীর ভালো লাগেনা। সুপ্তী প্রদীপের সাথে থাকতে চায়। সুপ্তীর বাচ্চাটা জন্মের পর বাবার কোলে কাঁদুক সেটা চায়। ছোট ছোট চোখ দিয়ে কষ্ট করে আলো দেখবার সময় বাবার হাত সন্তানের শরীরে থাকুক সেটা চায়। সুপ্তী চায় প্রদীপের শরীর ঘেষে বসে থাকতে সারাজীবন। সেটা হলনা। প্রদীপ দিলনা।
মাইকেল লোকটা ভাল। গাড়ির শোক ভুলে প্রথম থেকেই সুপ্তীর পাশে বসে আছে। ভাসা ভাসা বাংলাতে সুপ্তীকে বোঝানোর চেষ্টা করছে। বলেছে সুপ্তীকে নেপালে পৌছানোর ব্যবস্থা করে দেবে। নেপাল ছোট দেশ। প্রদীপকে খুঁজে বের করা নাকি কঠিন কিছু হবেনা।
সব কথা শুনেও সুপ্তীর মন মানেনা। একটানা কেঁদে সে হাঁপিয়ে পড়ে। পেটের ভেতর থাকা বাচ্চাটার জন্য খায়। মাইকেল খাবার নিয়ে আসে। ফিস ফ্রাই। পাহাড়ে মাছ পাওয়া যায় নাকি? সুপ্তী কথা না বলে খেয়ে যায়। মাছটার স্বাদ আইরের মতন। একদম দেশী মাছ। প্রদীপের কথা মনে পড়ে যায়। প্রদীপের এই মাছ পছন্দ। চোখ ভেজে সুপ্তীর। মনে পড়ে বৌদ্ধ পাড়ার কথা। প্রেম শুরুর দিকে বাড়ির সামনে এসে দাড়াত প্রদীপ। দাড়িয়ে থাকত সারাদিন, সারারাত। জানালার পাশ দিয়ে গেলেই চোখাচোখি হত প্রদীপের সাথে। একদিন বাড়ির সামনে পথ আটকায় সুপ্তীর। বলে, 'একটা ভালো জিনিষ দিবো। নিলে নিবা না নিলে ফেরত দিবা।' কথাটা বলেই চুমু খায় সুপ্তীর ঠোটে। সুপ্তী অবাক হয়। এই সময় চুমু ফেরত দেওয়া যায়না। ভালো লাগেনি তার কাজটা। প্রদীপের গালে চড় বসিয়ে দেয় সুপ্তী। গোয়ার প্রদীপের অপমানবোধ প্রবল। সে আর আসেনি। দাড়ায়নি সুপ্তীর বাড়ির সামনে। সুপ্তীর খারাপ লাগতে শুরু করে। ঝুমুর নামের এক বান্ধবীকে নিয়ে সে নিজেই যায় প্রদীপের বাড়িতে। বাড়িতে পাওয়া যায়নি প্রদীপকে। বিএম কলেজের গেটের সামনে বাইক নিয়ে দাড়িয়ে ছিল প্রদীপ। সুপ্তীর বাড়িতে আসার খবর পেতে দেরি হয়না। সে বাইক নিয়ে ছুটে আছে। লাজুক সুপ্তী প্রদীপকে কাছে চুমু ফেরত দেয়। তারপর প্রেম। পাগল করা প্রেম। বেয়ারা প্রদীপের লাগাম টেনে ধরার প্রেম।
পারেনি সুপ্তী। প্রদীপ অন্যরকম। তাকে বেঁধে রাখা যায়না। সুপ্তী প্রদীপকে ভালোবাসে। এই দস্যিপনাই তার ভালো লাগে। জুলাই এর এই সকালে প্রদীপের কথা ভেবে খেতে খেতে আবার কান্না শুরু করে প্রদীপ।
সুপ্তী যখন কাঁদছে তখন প্রদীপ থাকার জন্য একটা জায়গা খুজছে নেপালে। ভালো হোটেলে ওঠার উপায় নেই। সব হোটেলে পাসপোর্ট চাচ্ছে। প্রদীপ পাসপোর্ট নিয়ে ঝামেলায় আছে। পাসপোর্ট দেখালেই পুলিশী ঝামেলায় পড়তে হবে। কোন একটা বাড়িতে থাকতে পারলে ভালো। শহরের ভেতর ছোট-খাট বাড়ি লুকানোর জন্য ভালো জায়গা।
আজকের আবহাওয়া সুন্দর। শীত শীত ভাব কম। রোদে ভরা আকাশ। ইন্ডিয়া-পাকিস্তানের ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। দোকানের সামনে, বাড়ির সামনে ভীড় করে লোকজন খেলা দেখছে। নেপালের বেশিরভাগ লোকজন ইন্ডিয়ার সার্পোটার। প্রদীপ ভীড়ের ভেতর লুকায় নিজেকে। তার ভয় হয়। ভয়টা বেড়ে গিয়েছে খুব।

সুপ্তিকে নিয়ে টেনশন হচ্ছে খুব। কাঁদছে নিশ্চিত। নিজেকে অপরাধী মনে হয়। আর কোন উপায়ও ছিলনা। সুপ্তীর কিছু হলে সে সহ্য করতে পারবেনা। তার বাচ্চাটার কিছু হলে সে মেনে নিতে পারবেনা। এক জীবনে মানুষের ক্ষতিই করা হর। আজ একটি ভালো কাজ করা হোক। বউ আর সন্তানটার জীবন বাঁচানো হোক।
প্রদীপ একটা রেস্টুরেন্টে ঢোকে। নেপালী খাবার মাসুর অর্ডার দেয়। চাল, খাঁসি আর শূকরের মাংস দিয়ে তৈরি সুস্বাদু এই খাবার নেপালে আসা পর্যটকদের কাছে খুব জনপ্রিয়। প্রদীপ সময় নিয়ে খায়। অনেক খায়। ক্ষিধে পেটে কাজ করা যায়না। অনেক কাজ করতে হবে আজ।
হিন্দীতে ঝানু সবাই। পাশের দেশ থেকে আসা মানুষে ভর্তি নেপাল। ছোট দেশ কিন্তু সুন্দর। লোডশেডিং এর ঝামেলা ভয়ানক। মানুষজন ধূর্ত। পর্যটকদের টাকা-পয়সা হাতিয়ে নেবার তালে থাকে।
একটা লোক এসে রেস্টুরেন্টে ঢুকে প্রদীপের সাথে কথা বলে। প্রদীপ তার হাতে কিছু টাকা তুলে দেয়। এই লোককে বিশ্বাস করা যায়। বিশ্বাস না করে উপায় নেই। প্রদীপ গর্তে পড়েছে। এখন গর্ত থেকে উঠতে হলে কারো না কারো সাহায্য দরকার। শুক্র নাকি বন্ধু এসব নিয়ে ভাবার সময় এখন নেই। লোকটার নাম ভৈরব। সে নওরোজ শাহের লোক। নেপাল থেকে কিছু নেশা জাতীয় ট্যাবলেট বাংলাদেশে নিয়ে আসে ভৈরব। এই ব্যবসায় ভালো আয় হয় নওরোজ শাহের। প্রদীপের সাথে ভালো সম্পর্ক ভৈরবের। ভৈরব প্রদীপের ভক্ত। নওরোজ শাহের এদিকের ব্যবসা মাঝে মাঝে সামাল দিতে হত প্রদীপকে। তাই ফোনে ফোনে অনেক কথা হয়েছে ভৈরবের সাথে। গড়ে উঠেছে ভালো একটা সম্পর্ক। ভৈরব বাংলাদেশেরই লোক। কিন্তু জীবন-জীবিকা সবকিছু নেপালেই। ভৈরবের মতন এমন আরো অনেক বাংলাদেশী আছে যারা নেপালেই স্থায়ী আবাস গড়েছে।
'বিরাটনগরের দিকে যান। নিরাপদ আছে।' রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে প্রদীপের সাথে হাটতে হাটতে কথা বলে ভৈরব।
'থাকার জায়গা দরকার ভাই। এদিকে কিছু তো চিনিনা। টাকা পয়সা নিয়া ভাবনার কিছু নাই।' কথাগুলো বলার সময় খুব অসহায় মনে হয় প্রদীপকে।
'বিরাটনগর ছোট শহর। লুকায় থাকেন কেউ টের পাইবেনা। আমি ব্যবস্থা করতেছি। ভাই মনে করলে আর টেনশান নিয়েন না।'
'টেনশান নাই আমার। তুমি চিনো আমারে।'
'তা চিনি। ভাই ভাবিরে কই রাখলেন?'
'আছে। আনি নাই নেপালে। শরীরের অবস্থা ভালো নাতো।' সুপ্তী কোথায় আছে লুকায় প্রদীপ। ভৈরবকে এত কিছু বলা যাবেনা।
কথা আপাতত এখানেই শেষ হয়। কাছের ছোট্ট একটা হোটেলে প্রদীপকে নিয়ে ঢোকে ভৈরব। কিছুক্ষনের জন্য বিশ্রাম। আসার পথে অ্যাভেঞ্জার গাড়িটা পথের ওপর ফেলে এসেছে প্রদীপ। ওটা নিয়ে ঝামেলা হতে পারে। পুলিশের কাছে ধরা পড়ার ভয় আছে।
হোটেলের অবস্থা ভালো না। বাথরুমে দরজা নাই। কল থেকে কেমন লালচে পানি পড়ে। আয়রন মনে হয় খুব বেশি এদিকের পানিতে। প্রদীপের মেজাজ খারাপ হয়। শরীরটা ভেজানোর দরকার ছিল। লম্বা একটা গোসলের পর কড়া এক কাপ চা পেলে ভালো হত। ভৈরবকে বিদায় জানায় প্রদীপ। সে জানায় ঘন্টাখানেক পর সবকিছু ঠিকঠাক করে হোটেলে আসবে। প্রদীপকে একটা ফোন নাম্বার দেয়। খুব বেশি প্রয়োজন হলে যেন বাইরে থেকে ফোন দিতে পারে।
প্রদীপ দাড়িয়ে থাকতে পারেনা। ক্লান্ত শরীর। সারারাত গাড়ি চালানোর ধকল কম না। প্রদীপ শুয়ে পড়ে বিছানায়। সাথে সাথে ঘুম হয়। ক্লান্তি এই ঘুমে কোন দু:স্বপ্ন এসে ভীড় করেনা। শুধু সুপ্তীকে দেখা যায়। দেখা যায় একটা ছোট্ট মেয়েকে। মেয়েটা খোলা সবুজ মাঠে ছোট ছোট পা দিয়ে দৌড়ায়। হোচট খায়। হোচট খেলেই সুপ্তী দৌড়ে এসে মেয়েটাকে ধরে। বুকে চেঁপে ধরে। কোলে তুলে নেয়। আদর করে। মেয়েটার চেহারা ভালো করে দেখা

যায়না। মাঠের একপাশে আকাশ এসে ঘুমায়। সুন্দর। ঘুমের ভেতর এই একটাই দৃশ্য বারবার দেখতে থাকে প্রদীপ। ঘুম ভাঙে ঘন্টাখানেক পর। ঘামে ভেজা শরীর প্রদীপের। দু:স্বপ্ন না দেখেও কেন এমন হল বোঝা যায়না। প্রদীপ রুমে তালা দিয়ে হোটেলের নিচে যায়। ভৈরব এখনো আসেনি। চায়ের তৃষ্ণা প্রবল হয় প্রদীপের। এদিকে মাটির ঘটিতে চা খায় সবাই। প্রদীপ একটা দোকানে গিয়ে চা খায়। দুধ চা। খাওয়ার পর ফ্রেশ লাগে শরীর। সুপ্তীর ভালো লাগত এই চা। মেয়েটা চায়ের জন্য পাগল। চায়ের জন্য পাগল সে। বাড়িতে তো বাটিতে করে চা খায়। চায়ে মুড়ি ভিজিয়ে খাওয়ার মতন আনন্দ নাকি সে আর কিছুতে পায়না। সুপ্তীর কথা ভাবতে গিয়ে আপনা আপনিই চোখ ভিজে যায় প্রদীপের। সে খারাপ মানুষ। কেন যে আবেগী হয়ে উঠছে বারবার বোঝা যায়না। বিরক্ত লাগে।

দূরে পাহাড় চোখে পড়ে। রোদ সরিয়ে একটু-আধটু কুয়াশা এসে নামে। মনে হচ্ছে সন্ধ্যে হতে হতে শীত পড়বে খুব। এখানের এটাই হয়ত নিয়ম। নেপালের মেয়েরা খুব সুন্দর। দেখলে চোখে শান্তি লাগে। খারাপ কিছু করতে ইচ্ছে করেনা। প্রদীপ চা শেষ করবার পরেও অনেকক্ষন দোকানের সামনে দাড়িয়ে থাকে। মানুষ দেখতে ভালো লাগে। মানুষের ভীড় টানে।

ভৈরবের আসতে দেরি হবে মনে হয়। প্রদীপ লোকজনকে জিজ্ঞেস করে বিরাটনগরের পথটা জেনে নেয়। কিভাবে যেতে হবে, কোথা থেকে উঠতে হবে বাসে জেনে নেয় সব। তাকে কেউ সন্দেহ করেনা। নেপালে এসব ঘটনা অতি সাধারন। পর্যটকদের ভীড়ে এই এলাকা জমজমাট থাকে সবসময়। দোকানদাররা ওত পেতে বসে থাকে নতুন লোকদের ঠকানোর জন্য।

প্রদীপ রুমে ফিরবে বলে ঠিক করে। ভৈরবের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। এদিককার কিছুই সে চেনেনা। একা বেরোলে বিপদ হতে পারে। সিড়ির প্রথম ধাপে পা ফেলতে না ফেলতেই গুলির আওয়াজ কানে আসে। দূর থেকে ভৈরব আর তার সাথে কিছু নেপালী পুলিশকে দৌড়ে হোটেলের দিকে আসতে দেখা যায়। প্রদীপ পালায়। পালায়। রুম থেকে কিছুই নেওয়া হয়না। টাকা-পয়সা, কাপড় কিছুই না। প্রদীপ যখন পালায় ঠিক সে সময় দার্জিলিং এর একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সুপ্তিকে। সময়ের আগে ব্যাথা উঠেছে তার। মাইকেল সুপ্তীকে নিয়ে ছোটে। ব্যাথায় চিৎকার করতে থাকে সুপ্তী। প্রদীপের নাম ধরে। এই সময়ে প্রদীপের পাশে থাকার প্রয়োজন ছিল। আসলেই প্রয়োজন ছিল।

১৪.

৩১ জুলাই, ২০০৬ : অন্যরকম অন্যমানুষ

নওরোজ শাহ রিভালবারটা হাতে নেন।

ওজন আছে। অনেকদিন পর ধরা হলো এসব কিছু। ধরার কারনও আছে। সকাল থেকে তার ছেলে হাওয়া। কোন খোজ পাওয়া যাচ্ছেনা। জাহাঙ্গীর জানাল এটা আযম সাহেবের কাজ। এই শহরে নওরোজ শাহের বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়া কুকুরকেও কেউ কিছু বলার সাহস পায়না। সময়মতন সবকিছু করা উচিত। সময় চলে এসেছে।

নওরোজ শাহ ঠিক করেছেন গুলি করবার পর নওরোজ শাহের কবজি কেটে নেবেন। চোখ দুটোও তুলে নেওয়া যায়। শহরের লোকজন তবে নওরোজ শাহকে নিয়ে গল্প করবে অনেকদিন।
জয়নাল সাহেবের ঘটনাটা শুনেছেন নওরোজ শাহ। রিপাকে ঢাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন তিনি। আযম সাহেবের বাড়াবাড়ি এখন চরমে। এত সাহস পাবার কথা নয়। নিশ্চয়ই পেছনে কেন্দ্রের হাত আছে। প্রায় পনের জনের একটা দল নিয়ে নওরোজ শাহ বের হন। তার গাড়ির পেছনে অনেকগুলো বাইক। তারা প্রথমে যান কালুশাহ সড়ক। নওরোজ শাহ একটা ছোট্ট টিনের বাড়ির সামনে দাড়ায়। ভেতরে ঢুকে একজন পীরের দোয়া নেন। পানি পড়া নেন। এই পীরকে মানেন তিনি। পীর বাবার দোওয়া দরকার। নওরোজ শাহ কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন না। পীর-ফকির মানেন না। কিন্তু এই বাবাকে অমান্য করবার উপায় নেই। বড় শান্তি লাগে এখানে আসতে। বড় কোন সমস্যার আগেই এখানে আসেন তিনি।
জাহাঙ্গীর নওরোজ শাহের পাশে বসা। সে কিছু একটা ব্যাপার নিয়ে চিন্তিত। রাস্তাঘাটে ভীড় খুব বেশি আজ। এই ছোট্ট শহরেই জ্যামে পড়তে হচ্ছে। নওরোজ শাহ গাড়ি নিয়ে এমপির সাহেবের বাড়িতে যান। জ্যাম ঠেলে যেতে অনেকটা সময় লেগে যায়। নওরোজ এমপি সাহেবের বাড়ির গেটে দাড়ান। তার শরীর ভালো না। বাড়ির ভেতর জাহাঙ্গীরকে পাঠান। জাহাঙ্গীর কয়েকজন ছেলেকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে যান। তাদের সবার হাতে চাইনিজ কুড়াল আর কাটা রাইফেল। কিছুক্ষন পরেই বাড়ির ভেতরে গুলির আওয়াজ পাওয়া যায়। আওয়াজ বাড়তে থাকে ধীরে ধীরে। নওরোজ শাহ তখন নিচে দাড়িয়ে দলের কমবয়সী এক ছেলের সাথে কথা বলতে থাকেন।
'ডাইল খাস।'
'জ্বি' অল্প বয়সের ছেলেটা আস্তে করে বলে। এত অল্প বয়সেই কেন এই কাজ করা শুরু করল কে জানে!
'তোর শরীরের এই অবস্থা ক্যান? দেখে মনে হয় তো ফেনসিডিল খাস। শরীরের খেয়াল রাখ।' নওরোজ শাহকে দেখে মনে হয় তিনি খোশ মেজাজে আছেন। গল্প জমানোর জন্য কথা বলছেন।
'জ্বি রাখব।'
'অস্ত্র চালাস ক্যামন? হাতের জিনিষটা তো খারাপ না।'
'জাহাঙ্গীর ভাই দিছে।'
'মানুষ মারছিস কহনও?'
'জ্বি না।'
'আইজ সুযোগ পাবি। ওয়েট কর।' নওরোজ শাহ গুনগুন করে গানও গায়।
জাহাঙ্গীর আর ছেলেগুলো গেটের বাইরে আসে। বাড়ি তাক করে ককটেল ছোড়ে কয়েকটা। এমপি সাহেবের বউকে চুল ধরে টেনে নামানো হয় নিচে।
'শ্যাষ' জাহাঙ্গীর এসে নওরোজ শাহকে বলে। তার শার্ট-প্যান্টে রক্ত লেগে আছে। ভেতরে হয়ত ধস্তাধস্তি হয়েছে। জাহাঙ্গীরকে হাঁপাতে দেখে মনে হয় পরিশ্রম হয়েছে খুব।
'জয়নাল সাহেব আছে?' নওরোজ শাহ গাড়িতে উঠতে উঠতে বলে।
'না নাই। পাই নাই।' জাহাঙ্গীরকে একটু দিশেহারা মনে হয়।
'ভুল হয়ে গেল। জয়নাল সাহেবরেই দরকার ছিল।' কথাটা বলেই নওরোজ শাহ গাড়ি ছাড়তে বলেন। গাড়ি বহর আবার শহর ঘুরতে থাকে। ঘুরে ঘুরে এমপি সাহেবের অফিস আর তার কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ককটেল ছোড়া হয়। আগুন লাগানো হয় তার বিশ্বস্ত লোকদের বাড়িতে, অফিসে। শহর জুড়ে লোকজন পালাতে থাকে। স্কুল ফেরত বাচ্চারা, মায়েরা ভয়ে চিৎকার করতে থাকে। লোকজন দোকানপাট বন্ধ করে। কেউ কেউ বাড়ির দিকে ছোটে। অফিস-আদালতের কাজ কর্ম থমকে যায়। ছোট্ট শহর। মাত্র কয়েক ঘন্টার ভেতর অচল হয়ে যায়। ভাঙাচোড়া গাড়ি নিয়ে পুলিশ নামে রাস্তায়। এমনি এমনি টিয়ার গ্যাস ছোড়ে। সাধারন মানুষগুলোর চোখ হতে জল ঝড়ে। এছাড়া আর তেমন কিছু হয়না। পুলিশের কেমন গা ছাড়া ভাব।

জয়নাল সাহেবকে তন্ন তন্ন করে খোজা হয়। হাসপাতাল রোড থেকে শুরু করে জেলগেট প্রায় সব জায়গাতেই ছোটা হয়। জয়নাল সাহেবকে পাওয়া যায়না। পুলিশের এলোপাথাড়ি গুলির শব্দ শোনা যায়। নওরোজ শাহের লোকরাও গুলি চালায়। এলাকা গরম হয়ে ওঠে। নওরোজ শাহ নিজের ছেলেকে খুজতে থাকেন। ডাক্তার ছেলে তার অতি পছন্দের। এই ছেলের কিছু হলে শহরের একটা মানুষও আস্ত থাকবেনা। আধঘন্টার মাঝখানে নওরোজ শাহের বহরে আরও কিছু ছেলেরা এসে যোগ দেয়। বহর বড় হয়।

এমপি সাহেবের বউ নওরোজ শাহের গাড়িতে। সে চুপ করে আছে। এর সাহস অনেক। নওরোজ শাহের পাশে বসে অনেক বড় বড় মানুষ ভয়ে কাঁপে। এমপি সাহেবের বউকে ভীত মনে হয়না। তার মুখে মুঁচকি হাসি। এই হাসি দেখে মেজাজ খারাপ লাগে নওরোজ শাহের।

অমৃত লাল দে কলেজ থেকে একটু সামনে গিয়ে গাড়িটা দাড় করায় সে। গাড়ির দরজা খোলে। দলের চিকন চাকন ছেলে যার সাথে কথা হয়েছিল এমপি সাহেবের বাড়ির গেটের সামনে দাড়িয়ে তাকে ডাকে নওরোজ শাহ। ছেলেটা ভয়ে ভয়ে ছুটে আসে।

'মানুষ মারিস নাই আগে। তোরে সুযোগ দিতেছি। এমপি সাহেবের বউকে মার। গুলি কর।' চুল ধরে এমপি সাহেবের বউকে গাড়ি থেকে নামায় নওরোজ শাহ। মাথায় রক্ত উঠেছে। আজ সব ছারখার করে দিতে হবে। ক্যান্সারের রোগীটা কই থেকে এত শক্তি পায় কে জানে!

ছেলেটা কাঁপতে থাকে। এর আগে দু-একজন মানুষের শরীরে বড়জোর কোঁপ দিয়েছে সে। মানুষ মারার সাহস তাই হয়না। রিভালবারটা নিয়ে মাথা নিচু করে থাকা আর গতি নেই। নওরোজ শাহের রাগ পড়েনা। তিনি ছেলেটার হাত থেকে রিভালবারটা নিয়ে কয়েকবার ফাঁকা গুলি ছোড়েন। অনেকদিন পর গুলি ছোড়া হয়। ক্যান্সারের শরীরটায় ঝাকুনি লাগে একটু। রিভালবারটা এমপির বউয়ের দিকে তাক করেন নওরোজ শাহ। এই সময়ে এক অবাক কান্ড ঘটে। এমন ঘটনা নওরোজ শাহকে হারিয়ে দেবার যথেষ্ট। নওরোজ শাহের কাঁধে গুলি করে বসে জাহাঙ্গীর। নওরোজ শাহ মাটিতে পড়ে যায়। কাতরাতে থাকে। অল্প সময়ের ভেতর অনেক রক্ত যায় শরীর থেকে। প্রায় মুমুর্ষূ নওরোজ শাহকে গাড়িতে তোলে জাহাঙ্গীর। এমপি সাহেবের বউ আর জাহাঙ্গীর হাসতে হাসতে গাড়ির ভেতর বসে। নওরোজ শাহ গুলি খেয়েও জ্ঞান হারায় না। বড় বড় চোখ নিয়ে সে জাহাঙ্গীরকে দেখে। কিভাবে হিসেব নিকেশ ওলটপালট হয়ে যায় তা মেলাতে পারেন না নওরোজ শাহ। তিনি তো বোকা নন। তার সাথে তো এমন হবার কথা নয়। এই শহর তার হাতছাড়া হয়ে গেল। ছেলেটা বাঁচুক। তার পরিবার বাঁচুক। জাহাঙ্গীরের সাথে এমপি সাহেবের বউয়ের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। জাহাঙ্গীরকে এমপি সাহেবের বউ ধর্ম ভাই বানিয়েছে। অনেক আগে থেকে। এমপি সাহেব যখন নওরোজ শাহের হয়ে কাজ করত তখন জাহাঙ্গীর কাজ করত এমপির সাথে। বাড়িতে আসা-যাওয়া হত খুব। জাহাঙ্গীরের আপন বলতে কেউ নেই। একটা বড় বোনের শখ ছিল খুব। এমপি সাহেবের বউ দূর করেছে এই অভাব। নওরোজ শাহের সাথে এমপি সাহেবের দূরত্ব বাড়ার সাথে সাথে বাড়িতে আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে যায় জাহাঙ্গীরের। তখন বাইরে গোপনে দেখা হত বোনের সাথে। নওরোজ শাহ এই সম্পর্ক পছন্দ করবেনা না জানত জাহাঙ্গীর। নওরোজ শাহের পাগলামী মেনে নেওয়া যাচ্ছিল না আর। বেঁকে বসার জন্য একটা সুযোগ খুঁজছিল জাহাঙ্গীর। সুযোগ এসে যাওয়াতে আর না করেনি। তবে মাঝখান থেকে এমপি সাহেবটা মারা গেল। বোন বিধবা হওয়াতে কষ্ট পেয়েছে জাহাঙ্গীর। বোনের কষ্টের প্রতিশোধও নেওয়া হবে আজ। আজ নওরোজ শাহের এই শহরে শেষ দিন হোক এটা চায় জাহাঙ্গীর। তবে তার চাওয়ামতন সব কিছু হবেনা। আযম সাহেবের কাছে তুলে দিতে হবে নওরোজ শাহকে। আযম সাহেব নওরোজ শাহকে মারবেন কিনা জানেনা জাহাঙ্গীর। সে ছোট মানুষ। এত কিছু জানার দরকারও তার নেই। বোন ভালো থাকুক, সে থাকুক এতেই খুশী। জাহাঙ্গীর অল্পতেই খুশী। মাথার ওপর থাকা মানুষগুলোকে এ কথা বলেছে সে।

নওরোজ শাহ কাঁতরায়। গুলি না ক্যান্সার কোনটা বেশি যন্ত্রনা দিচ্ছে বোঝা যায়না। একটা সময় জ্ঞান হারায় নওরোজ শাহ। গাড়ি বহর নিয়ে বিবির পুকুরের দিকে যায় জাহাঙ্গীর। এরকমই নির্দেশ এসেছে ওপর মহল থেকে।

অক্সফোর্ড মিশন স্কুলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার ওপর পোড়ানো টায়ার চোখে পড়ে। নওরোজ শাহকে গুলি করবার ঘটনা এখনও তারা ছাড়া কেউ জানেনা। রাস্তায় টায়ার পোড়ালো কারা বুঝে ওঠেনা জাহাঙ্গীর। বাইক থেকে ছেলে গুলো নেমে পথ পরিস্কার করে। পথে কোন মানুষজন নেই। হয়ত হুজুগে অল্পবয়সী ছেলেরা টায়ার পুড়িয়ে উল্লাস করেছে। বহরের লোকজন সব জাহাঙ্গীরের বিশ্বস্ত। তারা নওরোজ শাহকে মানেন না। জাহাঙ্গীরকে মানে। এদের মাঝখান থেকে খবর ছড়ানোর কথা নয়।
জাহাঙ্গীর আযম সাহেবকে কল দেয়। তার বাসার দিকে আসবে কিনা জানতে চায়। আযম শাহ বিবির পুকুরের পাশেই অপেক্ষা করতে বলেন। জাহাঙ্গীর যাবার পথে সদর গার্লস স্কুলের সামনে একটু গাড়ি থামায়। ছোট্ট টং এর দোকান থেকে চা আর বনরুটি খায়। এই ঝামেলার ভেতরেও দোকানদার দোকান খোলা রেখেছে। বেশিক্ষন সময় নষ্ট করেনা জাহাঙ্গীর। এমপি সাহেবের বউকে সাথে নিয়ে যাবে না পথে কোন এক বাসায় নামিয়ে দেবে তা নিয়ে ভাবে জাহাঙ্গীর। ভাবতে ভাবতেই বিবির পুকুরের কাছে চলে আসে জাহাঙ্গীর। ভয়ানক জ্যাম। পুরো শহরের কোথাও কোন মানুষ নেই, গাড়ি নেই কিন্তু এখানে এত জ্যাম কেন তা বোঝার চেষ্টা করে জাহাঙ্গীর। সামনে গাড়িটা ঠায় দাড়িয়ে থাকবার কারনে জাহাঙ্গীরের গাড়ি থেমে থাকে। মেজাজ খারাপ করে সামনের গাড়ির ড্রাইভারকে গালি দিতে নামবার সময়ই গুলি এসে লাগে জাহাঙ্গীরদের গাড়ির সামনের কাঁচে। ভেঙ্গে যায় কাঁচ। তারপর কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষার পর গুলি চরতে থাকে। চলতেই থাকে।

১৫.

৩১ জুলাই, ২০০৬ : তলানিতে ছায়া

জয়নাল সাহেব গালি খেয়েছেন আযম সাহেবের কাছে।
চা দেওয়া হয়েছে। এই সময়ে পরপর দু-কাপ চা খান আযম সাহেব। জেসমিন টি। ঢাকা থেকে কিনে নিয়ে আসা হয় টি-ব্যাগ। চায়ের সাথে ক্রিম বিস্কুট । ক্রিম বড় পছন্দ আযম সাহেবের। বিস্কুটের থেকে চামচ দিয়ে ক্রিম তুলে খান তিনি। ভালো লাগে খুব। আলাদা করে কিনে শুধু ক্রিম খাওয়ার ভেতর এই মজা নাই।
'তোমার কানের নিচে দুইটা বাজাইতে পারলে ভালো লাগত।' ক্রিম খেতে খেতে কথা বলে আযম সাহেব। তাকে দেখে খুব ফুরফুরে মেজাজে আছেন বলে হয়। কিন্তু আজ এই সময় তিনি টেনশনে আছেন। এই ভয়ংকর টেনশনের সময় আগে আসেনি কখনও। আজই ঠিক হবে এই শহরের রাজা কে হবে। পরিকল্পনা মতনই হচ্ছে সব। তবুও ভরসা হয়না। দাবার গুটি ওল্টাতে সময় লাগেনা।
'গালি তো অনেক দিলেন। বাদ দ্যান। ভুল তো হইছে। ভুলে মাশুলও তো দিছি।' মন খারাপ করে চায়ে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে বলে জয়নাল সাহেব। চায়ে চিনি কম হয়েছে। তেতো একটা স্বাদ। চিনি নেবার সাহস এই মুহূর্তে পাচ্ছেনা জয়নাল সাহেব। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আজকের ভেতরেই পুরো শহরের ক্ষমতা চলে আসবে আযম সাহেবের হাতে। এই লোকের সাথে টক্কর দেওয়া ঠিক হবেনা।
জয়নাল সাহেব আগের দিন মাতাল হবার পর ঠিকঠাক বাড়ি এসেছেন। তার আর গাড়ির কারোরই কোন ক্ষতি হয়নি। রিপা এমন করতে পারে তা কখনও ভাবেনি জয়নাল সাহেব। তার রাগ হয়েছে। যতটা না রাগ হয়েছে

তার চেয়েও বেশি কষ্ট পেয়েছেন। ভালোবাসতেন রিপাকে। ঘরে তুলতে চেয়েছিলেন। ভালোবাসার মানুষ এমন করতে পারেনা। রিপা আসলে কখনও ভালোবাসেনি তাকে। সাধারন এক কর্মচারীই ছিল। পর কখনোই আপন হয়না। রিপার শাস্তি হবে। ঝামেলা শেষ হলেই ঢাকায় গিয়ে রিপাকে ধরবে জয়নাল সাহেব। মাথার সব চুল কেটে ন্যাড়া করে রাস্তায় নামাতেই হবে এই মেয়েকে। রাগ কমাতে এছাড়া আর কোন উপায় নেই। মনে মনে শপথ নেয় জয়নাল সাহেব।

'বাজে কাজ করছ। মদ খাওয়ায় অপরাধ নাই। অপরাধ হইল মানুষজনের সামনে মাতলামী করায়। তাও আবার এক বাজে মেয়ের সাথে হোটেলে গিয়া মাতলামী করলা।' একটা কাটা চামচ হাতে নিয়ে কথা বলে আযম সাহেব। চামচ দিয়ে একটু পরপর টেবিলে বাড়ি দিয়ে শব্দ করেন। আজব খেলা!

'অভ্যাস নাই তো। মদ খাইনা আমি।'

'আরে বাবা এই জন্যেই তো তোমারে পছন্দ ছিল এমপি পদের জন্য। লাইন ক্লিয়ার কইরা দিলাম তোমারে। এমপি সাহেবের বউ ফিল্ডে নাই। এমপি সাহেবের সব কাছের লোক নাই করে দিলাম। এত কিছুর পরেও তোমার সইল না। বাজে কাজ করলা। নাক কাটাইলা।' বলেন আযম সাহেব।

'ভুল হইছে। একটা সুযোগ দিয়া দ্যাখেন, ভালো কাজ করব।'

'একজনরে একবারের বেশি সুযোগ আমি দেইনা। আমি ব্যবসায়ী মানুষ। কষ্টের টাকা আমার। বাজে জায়গায়, বাজে মানুষের পেছনে টাকা ইনভেস্ট করলে লস আমার। তোমার পেছনে খরচ বন্ধ তাই আজ থেকে।'

'কি বলেন এইগুলা?' পাগলের মতন লাগে জয়নাল সাহেবের। অবাক হওয়ার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে। পাগল পাগল চোখে তাকানো জয়নাল সাহেবের দিকে তাকান আযম সাহেব। জীবনে এমন চাহনি তিনি অনেক দেখেছেন। মানুষের চোখে ভয় দেখতে তার ভালোই লাগে। হাতের চামচটা জয়নালের পেটে ঢুকিয়ে দেন আযম সাহেব। ধারালো মনে হয়। চামড়া ছিড়ে ভেতরে ঢোকাতে বেগ পেতে হয়না। রক্ত বের হয় অনেক। জয়নাল ধস্তাধস্তি করে। বাঁচার জন্য কি সব আবোল-তাবোল বলে। শেষ পর্যন্ত লাভ হয়না। মরতেই হয়। কোঁকাতে থাকা জয়নালের মুখ চেপে ধরে এসে আযম সাহেবের লোকজন। একটা সময় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়।

একজন গরম পানিতে লেবু মিশিয়ে নিয়ে আসে একটু পর। আযম সাহেব হাতের রক্ত পরিস্কার করেন। তারপর বের হন। গাড়িতে গিয়ে বসেন। গাড়িতে আগে থেকেই বসে আছে নওরোজ সাহেবের ডাক্তার ছেলে। নওরোজ সাহেবের ছেলেকে দেখে একটু হাসেন আযম সাহেব। গাড়িতে স্টার্ট দেয় ড্রাইভার। গাড়ি চলতে শুরু করার সাথে কথা বলেন আযম সাহেব।

'কেমন লাগল হারাইয়া গিয়া?' নওরোজ শাহের ছেলেকে প্রশ্ন করেন আযম সাহেব।

'নট ব্যাড।' ডাক্তার ছেলে আস্তে করে উত্তর দেয়। কথা শুনে মনে হয় বিরক্ত সে। কথা বলার ইচ্ছে নেই এখন।

'তুমি একটা মাস্টারপিস। তোমার বয়সে এমন বুদ্ধি কারও দেখিনাই। বিবাহ যোগ্য মেয়ে থাকলে আমার মেয়েরে তোমার কাছে বিয়া দিতাম। হা হা হা।'

'বিবির পুকুরের দিকে যান।' প্রায় আদেশের সুরে কথা বলে নওরোজ সাহেবের ছেলে। এই সুর শুনে অবাক হয়না আযম সাহেব। নওরোজ শাহের ছেলে। একই রক্ত। এমনটা হওয়া অস্বাভাবিক কিছু না। আযম সাহেবের মেয়ে থাকলে সত্যি সত্যি এই ছেলের সাথে বিয়ে দিতেন। এমন ছেলে ঘরে বাঁধিয়ে রাখার মতন। এই ছেলে যে হাতছাড়া করবে তার চেয়ে বোকা আর কেউ নেই। মাত্র পাঁচদিনে পুরো একটা শহরের গল্প বদলে দিতে সবাই পারেনা। রাজনীতি মিশে আছে এই ছেলের রক্তে। ডাক্তারী পড়া তার মানায় না। নওরোজ শাহ কখনও চায়নি ছেলে তার মতন বাজে কাজ করুক। ছেলের জীবন আর দশজনের মতন সাধারন হোক এটাই চেয়েছে। নওরোজ শাহ অসাধারন হয়েও বুঝতে ভুল করেছেন। জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। নিজের ছেলেকেই চিনতে পারেনি। ছেলের মাথাও যে তার মতন ত্যাড়া এটা বোঝা উচিত ছিল।

নওরোজ শাহ এমনিতেও মারা যেত। ক্যান্সারের রোগী টেকা সম্ভব না। নওরোজ শাহকে নিয়ে তাই চিন্তা ছিলনা তার ছেলের। ডাক্তার ছেলে সব সুন্দর করে গুছিয়ে আনতে চেয়েছে। একটা সুন্দর সময়ের অপেক্ষা করছিল। বাবার অজান্তে এলাকার প্রভাবশালীদের সাথে পরিচিত হয়েছে। গোপনে অনেকবার ঢাকা থেকে এসে মিটিং করেছে। ঢাকাতে বসেও ভার্সিটিতে মিটিং হয়েছে আযম সাহেব আর এলাকার কয়েকজন নেতার সাথে। সে খুজে খুজে বের করেছে সেই লোকগুলোকে যারা নওরোজ শাহকে পছন্দ করেনা। বছর দুই ধরে প্লান করছিল সে। কাজ হচ্ছিল না। এই সময়ে বড় সুযোগটা তৈরি করে নওরোজ শাহ নিজেই। এমপি সাহেবকে মেরে ফেলে সে সবাইকে খেপিয়ে তোলে। কেন্দ্র খুশি ছিলনা ব্যাপারটায়। তারা অন্য কোনভাবে সমস্যার সমাধান চেয়েছিল। নওরোজ শাহ তাদের কথা শুনত না। এমন লোক কেন্দ্রের পছন্দ করবার কথা না। এই ব্যাপারটা ই কাজে লাগায় নওরোজ শাহের। ঢাকায় থেকে কেন্দ্রের কয়েকজন লোকের সাথে দেখা করে। তার প্লানের কথা জানায়। খুব গোপনে করা হয় এই মিটিং। কেন্দ্রের উপরের মহলের লোকজন কেউ প্রথমে বিশ্বাস করতে চায়নি। তারা বুদ্ধিমান মানুষ। ডাক্তার ছেলের তাড়নাটা বুঝেছে। ক্ষমতার জন্য এই লোভ তাদের ভালো করেই জানা আছে। কেন্দ্র থেকে বলা হয়েছে আযম সাহেবের সাথে যোগাযোগ করতে। আযম সাহেব প্রথমে কাজ করতে রাজি হননি। কেন্দ্রের চাঁপ থাকায় কাজ করতে হয়েছে। বয়সের ব্যবধান থাকলেও এই কয়েকদিনে ভালো বন্ধু হয়ে উঠেছে দুইজন। চিন্তাভাবনা একইরকম বলে নওরোজ শাহের এই ডাক্তার ছেলেকে খুব পছন্দ হয়েছে আযম সাহেবের। জাহাঙ্গীর আগেই হাতে ছিল। ছোটবেলা থেকেই জাহাঙ্গীরের সাথে ভালো সম্পর্ক ছিলো। জাহাঙ্গীর বলেছিল এমপি সাহেবের বউয়ের কথা। জাহাঙ্গীরের এই ইমোশন কাজে লাগাতে ভুল করেনি নওরোজ সাহেবের ছেলে। জাহাঙ্গীরকে দিয়ে শাহ্-আলমকে মেরেছে। আজকেও জাহাঙ্গীরকে দিয়ে আসল কাজটা করানো হচ্ছে। নওরোজ শাহকে নিয়ে বিবির পুকুরে নিয়ে আসার দায়িত্ব জাহাঙ্গীরের।

বাবার জন্য খারাপ লাগে। চোখে একটু জল আসি আসি করে। কিন্তু উপায় নেই। নিজের কথাও তো ভাবতে হবে। নিজের ক্যারিয়ার, প্যাশন নিয়ে না ভাবলে হবেনা। নওরোজ শাহের ছেলে শোক সামাল দেয়। প্রদীপকে মারারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই লোকটা চালাক ছিল। কোনভাবেই বাগে আনা যাচ্ছিল। কেন্দ্র নেপালের পুলিশ বাহিনীর সাথে কথা বলা হয়েছে। প্রদীপ সন্ত্রাসী, খুনী। এ ধরনের লোকদের ছাড় দেবেনা নেপালের পুলিশ। পয়সাও ঢালা হয়েছে অনেক। নেপাল থেকে ভৈরবের সাথে ফোনে কথা হয়েছে। আজ-কালকের ভেতরেই প্রদীপের ব্যাপারে জানা যাবে। প্রদীপ মরলে আর কোন ঝামেলা থাকবেনা আশা করা যায়। গাড়ি বিবি পুকুরের সামনে পৌছায়। আযম সাহেবের নির্দেশ অনুযায়ী আগে থেকেই জ্যাম তৈরি করে আটকে রাখা হয়েছে জাহাঙ্গীর আর নওরোজ শাহকে। সমানে গুলি চলছে। পুলিশ এদিকে আসবে না। তাদের নিষেধ করা আছে। কাজ শেষ হলে ফোন করা হবে পুলিশকে।

নওরোজ শাহের ছেলে দূর থেকেই জাহাঙ্গীরের লাশটা দেখতে পায়। অনেকগুলো গুলি লেগেছে নিশ্চিত। রাস্তার ওপর পড়ে আছে। রক্তে সয়লাব চারপাশ। জাহাঙ্গীরের গাড়িবহরের লোকগুলো এক এক করে মারা যায়। গোলাগুলিতে মারা যায় আযমেরও অনেক লোক। নির্দেশ অনুযায়ী নওরোজ শাহ সহ তার গাড়িটা আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ঝলসানো হয় নওরোজ শাহ, জাহাঙ্গীর আর এমপি সাহেবের বউয়ের লাশ। গাড়ির ভেতরে বসে সবকিছু দেখে নেয় নওরোজ শাহের ছেলে। সে বুঝে গিয়েছে আজকের দিনটা তার। গোলমাল হবার সম্ভাবনাই নেই আর কোন।

এত সহজে সবকিছু কিভাবে তা বিশ্বাস হয়না ডাক্তার ছেলের। হয়তো বাবার মতন সম্মোহন করবার মতন কিছু পেয়েছে সে। গাড়ি থেকে নামেনা ডাক্তার ছেলে। সে এখানে এটা জানলে বিপদ। আযম সাহেবের ড্রাইভারকে আগেই হাত করা আছে। নওরোজ শাহের গাড়ি পোড়ানোর পর খুশিতে যখর আযম শাহ গাড়ি থেকে বের হবে তখনই তাকে গুলি করে নওরোজ শাহের ছেলে। পরপর তিন চারতে। এতবড় একটা ব্যবসায়ীর মরতে সময় লাগেনা। গাড়ির বাইরে পড়ে থাকে চুপচাপ। গোলাগুলির ভীড়ে, এত মানুষের ভীড়ে এই ব্যাপারটা কেউ খেয়াল

করেনা। মালিককে ছেড়ে আযম সাহেবের ড্রাইভার গাড়ি ঘোরায়। পনের বছরের বিশ্বস্ত ড্রাইভার। পয়সা সবাই খায়। ড্রাইভারও খেয়েছে। গাড়ি যায় নওরোজ শাহের বাড়ির দিকে। পরের অংশটুকু সাজাতে হবে এখন। পরিবারের অন্য মানুষগুলোর কাছে গিয়ে বাবার জন্য কাঁদতে হবে। দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে। এই অভিনয়ের অংশটুকু সহজ নয়।
এক দুই-তিন বাঘ থাকলে চলেনা। এই শহরে এখন বাঘ একটাই। নওরোজ শাহের ডাক্তার ছেলে। শাবাশ। এটা তার প্রাপ্য। পরিশ্রম তো কম হয়নি। বাড়ির পথে পথে যেতে যেত গাড়িতে একটু ঘুম চলে আসে নওরোজ শাহের ছেলের। ঘুমায়। ধকলের পর শান্তিতে একটু ঘুমায়। কেন ঘুমাবে না? মানুষ তো। ক্লান্তি তো থাকবেই। ঘুমাক।

১৬.

১ আগস্ট, ২০০৬ : নটে গাছ

বুকে গুলি লেগেছে প্রদীপের।
রাস্তার ওপর পড়ে আছে সে। আকাশের দিকে তাক করা মুখ। প্রদীপ আকাশ দেখে। মরে যাবার আগে আগে দেখতে থাকে ঝাপসা আকাশ। অনেক ওপর দিয়ে একটা প্লেন ওড়ে। প্রদীপের চোখে পড়ে। কি সুন্দর ডানা মেলে আকাশে ওড়া। প্লেন প্রদীপের পছন্দ। সেই ছোট্টবেলায় বাড়ির কিছুটা ওপর দিয়ে যখন প্লেন উড়ে যেত তখন প্রদীপ প্লেনের দিকে ঢিল ছুড়ত। মনে হত প্লেনের গায়ে লাগলে প্লেন নিচে নামবে। তারপর কতশত গল্প হবে পাইলট আর যাত্রীদেও সাথে। আহা, সোনায় মোড়ানো শৈশব। প্রদীপ মাটির মানুষ। তবুও আকাশে ডানা মেলে ওড়ার আজন্ম সাঁধ ছিল তার।
বুকে গুলি নিয়ে আকাশ দেখতে কষ্ট হয় প্রদীপের। বিরাটনগরের এক ছোট রাস্তার ওপর পড়ে থেকে লাশ হবার জন্য অপেক্ষা করে সে।
এই বিরাটনগর শহর হিসেবে খুব বড় নয়। হাজার পাঁচেক মানুষের বাস এখানে। ছিমছাম,শান্ত একদম চারপাশ। দোকানপাটও নেই তেমন একটা। তবুও এলাকার লোকজন একে শহর বলে। বলে আনন্দ পায়। ভৈরব আর পুলিশের তাড়া খেয়ে এখানেই পালাতে এসেছিল প্রদীপ। লাভ হয়নি। গুলি খেয়েছে।
শহরের একদম পাশ ঘেষেই চলে গেছে কোসি নদী। নেপালের সবচেয়ে ছোট্ট নদী। নেপালীরা নদীটিকে আদর করে বলে ‘তিরমান’। ‘তিরমান’ মানে ছোট্ট বাচ্চা। এই তিরমানের দু-পাশেই পাহাড়। পাহাড়ের ওপর বছরের

বারো মাসই জমাট বেধে থাকে কাগুজে রং এর মেঘ। মেঘ দেখতেই বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে ভীড় করে পর্যটকরা। বাড়তি লোকের আনাগোনায় শহরের মানুষ তখন পাঁচ থেকে বেড়ে দাড়ায় পনেরতে। জমজমাট থাকে এলাকা। খাবারের দোকানগুলো খোলা থাকে চব্বিশ ঘন্টা। মদের দোকানগুলোতে রাতভর চলে গান, আড্ডা, নাচ। নিরাপত্তা জোরদার না করে কোন এক অজানা কারনে এসময় পুলিশরাও কাজে ঢিল দেয়। দালালরা থানায় থানায় পৌছে দেয় মদ আর নারী। এ সময় বড়ই আনন্দের। পুলিশ, আসামী, চোর, চোট্টা,সাধারন মানুষ সবার জন্যে আনন্দের। শহরটার কথা জানা ছিল আগেই। অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য এই শহরে তাইতো আসা। এসে লাভ হয়নি। অনেক বড় কেউ খেঁপেছে প্রদীপের ওপর। তাইতো আর বাঁচা গেলনা। মরার আগে প্রদীপের কিছু জানাও হলোনা।

সুপ্তীর কথা ভাবে প্রদীপ। কল্পনায় সুপ্তী চলে আসে পাশে। তার কল্পনাশক্তি প্রবল। সুপ্তী সে খাই খাই করতে দেখতে পায়। ক্ষিধে লাগাই স্বাভাবিক। গর্ভবতী হলে ঘনঘন ক্ষিধে পায়। প্রচন্ড ক্ষিধে আর ক্লান্ত শরীর নিয়ে কল্পনায় প্রদীপ সুপ্তীকে নিয়ে 'কোসি' নদীর তীরে এসে দাড়ায়। সুপ্তী এ সময় খাবারের কথা না বলে প্রথমেই বলে,' কি আশ্চর্য ! দেখেন না, কি আশ্চর্য ! পাহাড়ের মাথায় নাইমা আইছে ম্যাঘ। ভগবানের কান্ড দেখছেন !' কথা শুনে বিরক্ত হয় প্রদীপ। বিপদের মাঝে মেঘ নিয়ে কথাবার্তা ভালো লাগেনা। মেয়ে মানুষ এমনই। আখান্দা বলদ। তাদের কথা আমলে নিতে নেই। আমলে না নিয়ে প্রদীপের ভালো লাগে। বোকা বলেই তো বউকে এত ভালোবাসা। আসার পথে সুপ্তীকে এই নদীটার কথা বলেছিল প্রদীপ। সুপ্তীর কি মনে আছে?

মরে গেল কিনা বুঝতে পারছেনা প্রদীপ। অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে আসছে। আপনা আপনি নিজেকে সে জিজ্ঞেস করে, 'বেঁচে আছি কি?'

কে জানি বলেছিল সুখের দিন সবার জীবনে আসে, আসবে। আজ কিংবা কাল। যতসব আজগুবি কথা। কিছু মানুষের সারাজীবন বৃষ্টিতে একাই ভিজতে হয়। তার হাত ধরে একটু সুখের জন্য পাশে কেউ থাকেনা। কানের কাছে মুখ এনে কেউ আস্তে করে বলেনা 'সারাজীবন পাশে থাকবো। ভয় নেই।' গল্প আর জীবন এক নয়। জীবন বড় রুঢ়। টেনে নিতে কষ্ট হয়। প্রদীপ আর সুপ্তীর সারাজীবন পাশাপাশি থাকা হয়না।

প্রদীপ যখন মরার জন্য অপেক্ষা করছে তখন দার্জিলিং এ ব্যাথা উঠেছে সুপ্তীর। আজই বাচ্চা হবে। হাসপাতালে মাইকেল আসে সাথে। সুপ্তী ব্যাথায় চিৎকার করে। তার কেন জানি মনে হয় আজ সে প্রদীপকে হারাবে। সিনেমার মতনই আগে আগে বুঝে যাওয়া। তীব্র ভালোবাসায় এমনটা সত্যিই বোঝা যায় যে। সিনেমা লাগেনা।

জ্ঞান হারানোর মতন ব্যাথা। সুপ্তী জ্ঞান হারায় না। তার টনটনে হুশ। সে প্রদীপের কথা ভাবে। এলোমেলো কথা ভাবে। আচমকা কি যেন হয়। সব ভাবনাকে বিদায় জানায় সুপ্তী। মাথার ভেতর শুধু বাচ্চাটা। যে একটু পর পৃথিবীর আলো দেখবে। ছোট ছোট হাত, আঙ্গুল দিয়ে আলো শরীরে মাঁখবে। সুপ্তি সেই বাচ্চার শরীরে নাঁক ডোবাতে চায়। নতুন করে জীবন গোছাতে চায়। প্রতিদিন পৃথিবীতে কতজন মরে আর তার বিপরীতে কতজন জন্ম নেয় এসব নিয়ে ভাবলে শোকে শোকেই কেটে যাবে এক জীবন। বাঁচতে হবে। কষ্ট নিয়ে হলেও মানুষকে বাঁচতে হয়।

বাচ্চাটা আসে পৃথিবীতে। কাঁদতে কাঁদতে জানান দেয় আগমনী বার্তা। প্রদীপের সন্তান সে। সুপ্তীর সন্তান। একই সময় কিংবা কিছু আগে পরে বিরাটনগরে মারা যায় প্রদীপ। তার লাশটা নিয়ে যায় কাছেই থাকা পুলিশরা। তাদেরই কারো একজনের গুলিতে মারা গেছে এই খুনী। প্রদীপ লাশ হয়। লাশ হবার কয়েক সেকেন্ড আগেও যেন সে তার সন্তানের কাণ্না শুনতে পায়। অলৌকিক বৈকি! তার কেন জানি মনে হয় এই কান্না আর দশটা স্বাভাবিক বাচ্চার মতন কান্না হয়। এই কান্না পিতার জন্য শোক। ভাবুক। এই ভেবে প্রদীপ মরার আগে একটু হলেও আনন্দ পাক।

সবসময়ই তো কষ্টের কথা হয়। আজ না হয় আনন্দের কথা হোক, দু:খ ভোলার কথা হোক, ভালোবাসার-ভালোলাগার কথা হোক। কথা হোক জীবনের। আসুন, প্রদীপ বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনি। শুনে শান্তি পাই। সদ্য জন্ম নেওয়া শিশুর কান্নার চেয়ে মধুর আওয়াজ পৃথিবীতে আর নেই। সত্যি নেই। বিশ্বাস করুন। কসম।